সোহাগপুরের বিধবা কন্যারা

১৯৭১

মামুন-উর-রশীদ

www.pathagar.com

সোহাগপুরের বিধবা কন্যারা

১৯৭১

হারুন-উর-রশীদ

www.pathagar.com

©
লেখক

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৮/ফেব্রুয়ারি ২০১২

সরবৃত্ত প্রকাশন ৪৫ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ কর্তৃক
প্রকাশিত এবং ঢাকা প্রিন্টার্স ৩৬ শ্রীশদাস লেন ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত
অক্ষরবিন্যাস ঈশিন কম্পিউটার ৩৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
নিয়াজ চৌধুরী তুলি

দাম : ১০০.০০ টাকা মাত্র

ISBN 978 984 598 8939 51 2

Sohagpurer Bidobakonnara 1971 by Mamun-ur-Rasghid
Published by Mohammad Rahmat Ullah,
Sorobritta Prokashon, 45 Banglabazar, Dhaka-1100
First Edition : February 2012, Price Tk.100.00 Only. $ 5.00

U.K. Distributor : Sangeeta Limited, 23 Brick Lane, London
U.S.A. Distributor : Muktadhara, 37-69. 2nd floor, 74 St, Jackson Height, N.Y. 11372
Canada Distributor : Anyamela, 300 Danforth Ave. (1st floor, Suite-202), Toronto
ATN Mega Store, 2970 Danforth Ave, Toronto

www.pathagar.com

যাদের নিয়ে লেখা এ বইটি
তাদেরকে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখকের কথা

২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস। এই দিনের প্রথম প্রহরে বাঙালি জাতির জন্য একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষিত হয়েছিল। উপমহাদেশের এই ভূখণ্ডের বাঙালি জনগোষ্ঠী স্বাধীনতা সংগ্রামে অবতীর্ণ হলে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কাল রাত্রিতে বর্বর পাকিস্তানি বাহিনী সর্বাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এ দেশের নিরীহ নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। জ্বালিয়ে দেয় লোকালয়। হামলা করে পিলখানা, বিডিআর, রাজারবাগ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস। এই পটভূমিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। যুদ্ধ চলে নয় মাস। ৩০ লাখ শহীদের রক্ত ও ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রম বিসর্জনের বিনিময়ে ১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর দেশ বিজয় লাভ করে।

আমি অভিনন্দন জানাই মুক্তিযোদ্ধাদের, সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে—যার নেতৃত্বে সেদিন এক হয়েছিল সমগ্র জনতা। আর এই বিজয় এনে দেওয়ার জন্য যারা নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, নির্যাতন সয়েছেন, যে নারীরা তাদের সম্ভ্রম হারিয়েছেন, আমি তাঁদের স্মরণ করি বিনম্র শ্রদ্ধায়।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পটভূমি

২৫ মার্চ ১৯৭১ কালরাত্রি থেকে শুরু করে দীর্ঘ ৯ মাস বাংলাদেশের জনপদে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী চালিয়েছে হত্যাকাণ্ড, লুটপাট, নারী নির্যাতন। জীবন মৃত্যুকে পায়ে দলে বাংলার দামাল ছেলেরা, বীর মুক্তিযোদ্ধারা ৯ মাস ব্যাপী লড়াই করে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের ময়দানে লড়তে লড়তে শহীদী মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করেছেন। অন্যদিকে হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসররা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করেছে মানুষের বাড়িঘর, গ্রাম, জনপদ। এরা গণহত্যা চালিয়েছে নির্বিচারে। এদের অত্যাচারে বিরাণ প্রান্তরে পরিণত হয়েছিল শহর-বন্দর-গ্রাম।

শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী ইউনিয়নের নাম কাকরকান্দি। পারো পাহাড়ের কোল ঘেঁষে নিভৃত এই গ্রামের নাম সোহাগপুর। অন্য দশটি গ্রামের মতোই সহজ সরল এখানকার মানুষ। কৃষির উপর নির্ভর করে এদের জীবিকা চলে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কিছু রাজাকারের সহযোগিতায় সোহাগপুর গ্রামে হামলা চালায়। ২৫ জুলাই ১৯৭১ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নির্বিচারে গুলি করে ১৮৭ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। স্থানীয় প্রফুল্ল দীঘি থেকে শুরু করে সাধুর আশ্রম পর্যন্ত দীর্ঘ ৬ ঘণ্টা তারা হত্যাযজ্ঞ পরিচালিত করে। কান্নার হু হু শব্দ ভেসে আসে এবাড়ি ওবাড়ি থেকে। যে নারীরা জ্ঞান হারিয়েছিলেন তারা জ্ঞান ফিরে খুঁজতে থাকেন প্রিয় স্বজনকে। এক সময় প্রিয় মানুষকে খুঁজে পেলেও তারা তখন চলে গেছেন পৃথিবী ছেড়ে। শরীরে গুলির চিহ্ন নয়তো বেয়োনেটের আঘাতে শরীর ছিন্নভিন্ন– কোনো রকম টেনে হিঁচড়ে এসব নারীরাই স্বামী, বাবা, শ্বশুর, অসুর কিংবা অইকে বেভাবে পারেন মাটি খুঁড়ে কবর দেন কাফন ও জানাযা ছাড়াই!

শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ির সোহাগপুর সেই থেকে 'বিধবাপল্লী' নামে পরিচিত। পায়ে হাঁটা পথের পাশেই ছোট প্রাচীর দেওয়া গণকবর। প্রতিটি কবরেই শহীদের নাম লেখা। সবাই পুরুষ। এক কবরে কোথাও একজন কোথাও তিনজন, কোথাও চারজন, কোথাও বা সাতজন। ইতিহাসের এক বিয়োগান্তক ঘটনা সোহাগপুর আমাদের মনকে তাই কাঁদায়, নাড়া দেয় হৃদয়ের গভীর থেকে। বলে, কাঁদো বাঙালি কাঁদো।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচি

করফুলি বেওয়া ১৩
নূরেমান ১৬
সমলা বেওয়া ১৯
জমিলা খাতুন ২১
হাজেরা বেওয়া ২৩
ফাতেমা বেওয়া ২৭
জরিতন বেওয়া ৩০
হাজেরা খাতুন ৩৩
লাকজান বেওয়া ৩৫
ওজুবা ৩৯
ছাহারা ৪২
সাহারা খাতুন ৪৪
হাসেন বানু ৪৬
হাসনা আরা বেগম ৪৯
জোবেদা খাতুন ৫৩

www.pathagar.com

www.pathagar.com

করফুলি বেওয়া
বয়স : ৭০
স্বামী : শহীদ রহিম উদ্দিন

তখন খুব সকাল। ঢাকা থেকে আমরা মাইক্রোবাস নিয়ে শেরপুর পৌঁছুলাম। ঢাকা থেকে যাত্রা শুরু করি ভোররাত ৩টায়। শেরপুর থেকে স্থানীয় সাংবাদিক মনি ভাই ও বাবলু ভাইকে তুলে সোহাগপুর গ্রামে পৌঁছুলাম। বেলা তখন প্রায় দশটা। আমরা প্রথমে করফুলি বেওয়ার বাড়িতে হাজির হলাম। তিনি জানতেন আমরা আসবো। কুশল ও পরিচয় পর্বের পর আমি মাইক্রোফোন তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। তিনি বললেন সেই ১৯৭১ সালের ২৫ জুলাই-এর ঘটনা।

সোহাগপুর গ্রামে আমরা এসেছিলাম নকলা থেকে। স্বামী মনে করেছিল এখানে অনেক ফসলি জমি রয়েছে। চাষাবাদ করে ভালই চলে যাবে দিন। কিন্তু সবই ওলট-পালট হয়ে যায়। শাওন মাসের দশ তারিখে গ্রামে পাকিস্তানি মিলিটারি এসে আমাদের সব স্বপ্ন চুরমার করে দেয়। আমার স্বামী ভেবেছিল, পাকিস্তানি মিলিটারি মারবে না—ওরা গর্ত খুঁড়তে বলবে, গোলাগুলি হলে হাত উপরে তুলতে বলবে। আগে এসব শুনেছিলাম। কিন্তু সে ধারণাটা করাই ছিল ভুল।

২৫ জুলাই ১৯৭১ সকালে নাস্তা কোনো রকম খেয়ে আমার স্বামী ও ননদ জামাই হাল নিয়ে মাঠে যায়। আমরা কেউ বুঝতে পারিনি এটাই হবে তার মাঠে শেষ যাওয়া। মাঠে চলে যাওয়ার পর আমি সংসারে কাজ করছিলাম। হঠাৎ কানে গুলির শব্দ শুনি। একটু চেষ্টা করলাম গুলির শব্দ কোন দিক থেকে আসছে। বুঝতে বাকি থাকলো না যে মাঠের দিক থেকেই ঐ শব্দ আসছে। কি করবো? দূর থেকেই বোঝার চেষ্টা করছিলাম মাঠে ঘটনার বিষয়টি কি হতে পারে। দেখি

www.pathagar.com

বেশ কিছু কৃষক মাঠে বসে আছে। মাঠে হয়তো কিছু একটা করছে। তখনও বুঝিনি ওরা মারা গেছে। গুলিতে ওদের পিঠ এফোড় ওফোড় হয়ে গেছে। প্রায় দেড়শো মিলিটারি মাঠে রয়েছে।

আমার স্বামী মাঠের কাজ ছেড়ে বাড়ির দিকে দৌড়ে আসার চেষ্টা করে। অনেক কষ্টে বাড়ি আসে। ঘরের দরজায় ওরা দাঁড়ানো ছিল। তখনই মিলিটারি বাড়িতে প্রবেশ করে ননদের জামাইকে কাছে ডাকে,

—বন্ধু এদিকে আসো। কোনো ভয় নাই—এদিকে আসো। তিনি বলেন।

—আমাকে মারবেন না স্যার।

—না, না, মারব না। এদিকে আসো।

কাছে গিয়ে হাত তুলে সালাম দেন। আর তখুনি পাশে থেকে অপর মিলিটারি পরপর কয়েকটা গুলি করে। ছিটকে পড়ে যায় সে। এ দৃশ্য দেখে আমার মাথা ঠিক থাকে না। এ সময় আমার স্বামী ঘরে লুকিয়ে ছিল। সে যাত্রা বেঁচে গেলেও কিছুক্ষণ পর গ্রামের ছোট একটা ছেলেকে সাথে করে পাকিস্তানি বাহিনীর সৈন্যরা আবার আমার বাড়ির উঠানে উপস্থিত হয়। মিলিটারি আসতে দেখে আমরা বিভিন্ন স্থানে লুকানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু কোথায় লুকাবো? খড়ের গাদা, রান্নাঘর আর গোয়ালঘর ছাড়াতো কিছু নেই। ননদ জামাই-এর মতো আমার স্বামীকেও ঘর থেকে ডেকে আনা হয়। ঘরের কাছেই তাকে গুলি করা হয়। পানির ড্রামটার পাশে স্বামী পড়ে আছে। ছটফট করছেন তিনি। আমার কোলে শিশু বয়সের ছেলেটা। আমি উঠে দাঁড়াই। হাঁটতে থাকি। পাশে তখনও ঐ মিলিটারি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাকে এভাবে আসতে দেখে ওরা সতর্ক হয়। একজন আমার কোল থেকে ছেলেটাকে জোর করে নিয়ে দূরে ফেলে। ও কেঁদে ওঠে। ওর চিৎকার করা কান্না চাপা পড়ে যায় গোলাগুলির শব্দে। মেঘের মতো ঐ গুলির শব্দ। ওদিকে দেখলাম বোনের স্বামীর লাশ পড়ে রয়েছে। স্বামীর কাছে যেতে চাইলে ওরা ধমক দেয়। আমি একবার ছেলের কাছে যাই একবার স্বামীকে ধরতে চাই। মিলিটারিরা আমার স্বামীকে একটা গুলি করে। এই গুলিতে স্বামীর পেটটা ফেটে যায়। নাড়িভুড়ি বেরিয়ে যায়। ভিন্নভিন্ন হয়ে যায় পেট। আমি বললাম, স্যার, আর মারবেন না, আর মারবেন না। আমরা কোনো অন্যায় করিনি। কি দোষ আমাদের?

www.pathagar.com

ঐ লোক বলে, চুপ! বেশি কথা বললে তোকেও গুলি করবো। আমার ছেলেকে গুলি করার জন্য উদ্যত হলে আমি আবারও বললাম, আমার স্বামীকে মারলা আমার ছেলেটাকে মেরো না। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলউল্লাহ—আমার বাচ্চাকে মেরো না।

তারপর ওরা আমার গোয়ালঘরের দরজায় শুধু শুধু গুলি করে চলে যায়।

আমি একা রইলাম, চিৎকার করলাম অনেকক্ষণ। কিন্তু সে কান্না শুনবার ছিল না। কেউ আসেনি। স্বামী, ননদের স্বামীও, বাবা, ভাই কেউ নেই। কি করবো? স্বামীর গলা ছিঁড়ে চোয়ালের সাথে ঝুলছিল। ভুঁড়িটাও বেরিয়ে গেছে। আমি ঘরের ভেতর থেকে একটা কাপড় নিয়ে এসে গলাটা পেঁচিয়ে দিলাম। পেটটাও কাপড় দিয়ে পেঁচালাম। স্বামীকে ওভাবে রেখে বাচ্চার সামান্য কিছু কাপড় নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। ফিরে গেলাম সেই নকলায়। যে নকলা থেকে সোহাগপুর এসেছিলাম কিন্তু সেখানে মন টেকেনি। স্বামী সংসার ফেলে মনটা আর পারেনি। তিনদিন পরেই ফিরে এসেছি পাগলের মতো।

বাড়িতে এসে যা দেখলাম তা দেখতে আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। যেখানে আমার স্বামী পড়ে ছিল সেখানেই দেখি স্বামীর ছেঁড়া লুঙ্গি, কিছু হাড়-গোড় পড়ে আছে। কতকগুলো কুকুর সেখানে রয়েছে। একটা শিয়াল দূরে দাঁড়ানো ছিল। আমাকে দেখে সে দৌড়ে জঙ্গলে চলে গেল। আমি কুকুরগুলোকে তাড়িয়ে স্বামীর পায়ের একটা হাড় ও হাতের ২টি আংগুলের হাড় কুড়িয়ে ছোট গর্ত করে সেগুলো মাটি চাপা দিলাম। আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না এগুলো আমার স্বামীর হাড়। কেন, কেন এমন হলো? আমার জীবনটাতো এরকম হবার ছিল না। এ হত্যার কি বিচার কোনোদিন পাবো না? এতোগুলো মানুষকে হত্যা করে ওরা চলে গেল! অথচ বিচার আমরা আজও পেলাম না!

www.pathagar.com

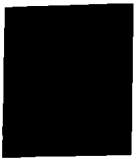

নূরেমান
বয়স : ৮০
স্বামী : শহীদ জসিমউদ্দিন

নূরেমানের বাড়ির পাশেই ছোট্ট পুকুর। কতকগুলো খেজুর গাছ নুয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নূরেমান পুকুর ঘাটে কাজ করছিলেন। বৃদ্ধা হলেও আজও শরীরে শক্তি রাখেন। তাঁকে কাছে ডাকলাম। পাশাপাশি বসালাম। তাঁর কাছে জানতে চাইলাম সেই মুক্তিযুদ্ধের সময়কার কথা। স্বামী ভাই হারানোর কথা। তিনি হু-হু করে প্রথমে কাঁদলেন। আমি মাইক্রোফোন বাড়িয়ে ধরলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি বলা শুরু করলেন সেদিনের কথা।

কি বলবো—সারাক্ষণ একটাই প্রশ্ন মনে হয়, আমার স্বামীকে কেন মারলো? কোনোদিন সংগ্রাম করি নাই, দেখি নাই মিটিং মিছিল। যুদ্ধ কি জানতাম না। কি করতে হয় তাও জানতাম না।

২৫ জুলাই ১৯৭১ এর কথা আজও মনে করতে পারি। মাঠে হাল নিয়ে প্রতিদিনের মতো আমার স্বামী গেল। স্বামী চলে গেলে শুনলাম পাঞ্জাবি মিলিটারি পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমে আসছে। আমার ভাই আর স্বামী পাঞ্জাবিদের দেখে হাল ছেড়ে বাড়িতে চলে আসে। আমি তখন সংসারের কাজ করছিলাম। আমার স্বামী ঘরের বাইরে ছিল। কি করা যায় আমরা এ কথাই বলছিলাম। আমার ভাই ভয়ে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকার জন্য চলে গেছে। বেশিক্ষণ হয়নি। দেখি পাঞ্জাবি মিলিটারিরা আমাদের বাড়ির উঠানে চলে এসেছে। তাদের দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। যাদের ভয়ে স্বামী-ভাই বাড়িতে এসেছে আশ্রয় নিতে, তারাই বাড়িতে এসে হাজির! ওরা আমার স্বামীকে কাছে ডাকতে থাকে।

www.pathagar.com

—আও, বন্ধু! তোমার কোনো ভয় নাই। তোমাকে মারবো না। শুধু বলো মুক্তি কোথায়?

—আমি কিছু জানি না স্যার।

—বন্ধু মিথ্যা ব'লো না। তোমার কোনো ভয় নাই বলছি। তুমি শুধু ওদের কথা বলো।

—আমরা কৃষক স্যার। কৃষিকাজ করি।

—বন্ধু কাছে আসো। ভয় নাই। সে হাত তুলে অফিসারকে সালাম জানাতে যাওয়া মাত্র একজন পাঞ্জাবি গুলি করে। পরপর কয়েকটা গুলি করে। স্বামী আমার পড়ে গেল। ছটফট করতে থাকে। আমি স্বামীর কাছে যেতে চাইলাম। পাঞ্জাবিটা যেতে দিল না। এদিকে পাঞ্জাবিরা বাড়ির অন্য পুরুষদের সম্পর্কে জানতে চাইল। আমার ভাইয়ের বউ কান্নাকাটি করছিল। কোলে ছিল ওর ছেলেটা। কত আর বয়স হবে, ৩/৪ বছর। ওরা ডাকতে থাকে ভাইকে।

—বন্ধু ঘর থেকে বেরিয়ে এসো। তোমার কোনো ভয় নাই।

এভাবে কয়েকবার ডাকাডাকি করে ভাইয়ের ছেলেটাকে কোল থেকে ছিনিয়ে ওকে পাশের খড়ের গাদার উপর ছুড়ে ফেলে গুলি করতে চায়—এটা দেখে ভাই এর স্ত্রী পাঞ্জাবিদের হাতে পায়ে ধরতে থাকে। ভাইকে মেরেছেন আমার অবুঝ শিশুটি তো কিছু করেনি—ও কি বুঝে? তাকে মারলে আমার কোনো সন্তান থাকবে না। কিন্তু ওরা মারার জন্যে প্রস্তুতি নেয়। ঐ সময় ঘর থেকে আমার ভাই বেরিয়ে আসে। ভাইটা ঘরের দরজায় চৌকাঠ ধরে ছিল। পাঞ্জাবিরা তাকে দেখেই দৌড়ে গিয়ে ধরে। অনেক টানাটানি করে ওরা। ভাই এদের শক্তির কাছে পারে না। ওকে টেনে নিচে নামিয়ে আনে। তারপর মুক্তি কোথায় জানতে চায়।

ভাই বুঝতে পারে—ওদের যাই বলি না কেন ওরা ওকে জীবিত রাখবে না। ভাই অনেককে চিনতো কিন্তু তাদের নাম পরিচয় কিছুই বলেনি। ওদেরকে বলে লাভও নেই। পাঞ্জাবিরা ভাইকে পর পর তিনটি গুলি করে। প্রথম গুলিটা চোয়ালে লাগে। চোয়াল থেকে বুয়ো সাথে ঝুলে পড়ে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে। একটা গুলি গিয়ে লাগে গলায়। শ্বাসনালিটা ছিদ্র হয়ে যায়। গর-গর গর-গর শব্দ হতে থাকে। তারপর তৃতীয় গুলিটা লাগে ভাইয়ের পেটে। এই গুলিতে ভাই-এর

www.pathagar.com

ভুঁড়িটা বেরিয়ে যায়। এই দৃশ্য দেখার মতো নয়। তবুও পাশে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে দৃশ্যটা দেখলাম। ওরা চলে গেল। আমরা ছোট ছেলেকে বুকে তুলে নিলাম। ওরা চলে যাবার সময় গরুর খরের দরজাতেও কতকগুলো গুলি করে। গোলাগুলি শেষ হলে আমরা ঘর থেকে বের হই। আশেপাশের বাড়ির সবাই বের হয়। কিন্তু কোথাও লোকজন পাইনি। পুরুষ শূন্য পুরো গ্রাম। চিন্তায় আকাশটা মাথায় ভেঙে পড়ে—এদের মাটি দেবে তাহলে কে? শরীরে এক ফোঁটা বল নেই। আমি কোনোমতে পায়ে হেঁটে গ্রাম ছেড়ে চলে যাই। পরে জানতে পেরেছি ৫/৬ জন গ্রামের মেয়ে তাদের মাটি দিয়েছে। কোনোমতে মাটিতে গর্ত করে তাদের কবর দেয়া হয়। কোনো জানাজা দেওয়া হয়নি—কোনো কাফনের কাপড় তাদের ছিল না। যে কাপড়ে মাঠে গিয়ে ছিল সেই কাপড়টাই সেদিন তাদের পরনে ছিল। যেখানে গোছল ছিল নিয়ম—সেদিন তাদের গোছল হলেও সে গোছলটা ছিল তাদেরই শরীরের রক্ত দিয়ে। শহীদের রক্তে রঞ্জিত ছিল তারা। সময়টা যতটুকু মনে করতে পারি সময়টাও ছিল আসরের ওয়াক্ত। চারজনের মাটি হয় এক কবরে।

মনের মাঝে স্বামীর অনেক স্মৃতি আজও লাল করে রেখেছি। মনে হলে বুকটা ভার হয়ে উঠে। অনেক কষ্ট পাই। বাড়িতে তেমন লোকজন নাই। কবরটা বলতে পারি না। এতোগুলো বছর পর এসব ঘটনা বলতে পেরে বুকটা একটু হালকা অনুভব করছি। কিন্তু আমার স্বামীর হত্যার বিচারটাতো হলো না। আমরা গ্রামের মানুষ। ছোট বেলা থেকেই ঘরের ভেতর মানুষ। পাড়ায় কোনো দিন ঘুরে বেড়াইনি। বিয়ের পরও স্বামীর সহায়তায় ঘুরাঘুরি করিনি—বিচার যে কার কাছে চাইবো এটাও বুঝিনি। শুধু এতটুকু আজ বলতে পারি—এ হত্যার বিচার হওয়া দরকার।

www.pathagar.com

সমলা বেওয়া
বয়স : ৭০
স্বামী : শহীদ সিরাজ আলী

বাড়ির পাশেই লাউ বাগান। সেখানেই পেলাম সমলা বেওয়াকে। তিনি মণি ভাইকে চিনতেন। মণি ভাই আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। সমলার বাড়িটা শূন্যই বলা চলে। মানুষ বলতে তিনি একাই। তার উঠানের পাশে পেলাম একটি মুরগির সাথে ৭টি মুরগির ছানা। এ নিয়েই তাঁর সংসার। সমলার কাছে জানতে চেয়েছিলাম তাঁর স্বামী হারানোর স্মৃতিকথা। তিনি এখানে দাঁড়িয়ে বললেন আর কাঁদলেন।

সকালটা এমন ছিল—চারিদিকে শুধু গুলির শব্দ। বিকট শব্দে সবাই দৌড়াদৌড়ি করছে। পালানোর কোনো চিন্তাই তখন মাথায় আসেনি। স্বামী বাসায় ছিল। আমার কোলে ৬ মাসের ছেলে। কি করবো বুঝতে পারছি না। এমনই সময় বাড়ির উঠানে একদল মিলিটারি এসে হাজির। আমার স্বামীকে নিয়ে ওরা টানাটানি শুরু করে। আমিও স্বামীকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করেছ।' এক মিলিটারি আমার ছোট্ট শিশুকে টেনে মাটিতে ফেলে তাকে গুলি করতে উদ্যত হয়। আমি চিৎকার করে উঠি। বলি, এতটুকু শিশুকে মারবেন না। স্বামীও বলে, আমার ছেলেকে মারবেন না। ওরা আমার স্বামীকে টেনে নিয়ে গেল। শত অনুরোধ নিবেদন করেও ওদের টলাতে পারিনি। পথে বের হয়েই আমার স্বামীকে গুলি করে। স্বামী মাটিতে পড়ে কাঁপতে থাকে। রক্তে ভেসে যায় মাটি। তখনও আমার ছোট সন্তানকে এক পাঞ্জাবি মিলিটারি রাইফেলের নল চেপে ধরে আছে। আমার পাগল মনটা চেয়েছে স্বামীর কাছে যেতে কিন্তু পারিনি। গেলেই হয়তো দেখবো বাচ্চাকেও গুলি করেছে ওরা। স্বামীর মৃত্যু নিশ্চিত জেনে ওরা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়।

বাড়িতে আমার শাশুড়ি ছিল। পাশের বাড়িতে ছিল অন্যান্য আত্মীয় পরিজন। সেখানেও ওরা হামলা করে। তিনজন পুরুষ মানুষকে ওরা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মাটিতে বসে পড়ে। কেউ ভয়ে শুয়ে পড়ে। দূরে যারা বিষয়টা বুঝতে পেরেছিল তারা দৌড় দেয়। দৌড়ে বাসা বাড়িতে কেউ আশ্রয় নেয়, কেউবা অন্যগ্রামের দিকে যাবার চেষ্টা করে।

মাঠের এমন পরিস্থিতিতে আমরা যারা বাসায় ছিলাম তারা পড়লাম ভীষণ সমস্যায়। কি করবো—এটাই ঠিক করতে পারলাম না। এমন করে সময় চলে যায়। ভাবছিলাম মিলিটারিরা হয়তো শত্রু খুঁজতে এসেছে। হয়তো মাঠ থেকেই চলে যাবে—এমনটা অনেকে ভেবে নেয়। আমাদের তেমনি ধারণা ছিল। কিন্তু তা হলো না। ওরা যমদূতের মতো আমাদের বাড়ি ঘেরাও করে। ঐ সময় আমার মামা ছিলেন দূরে, আমি ছিলাম রান্নাঘরে, সকালের খাবার রান্না করছিলাম। মিলিটারি বাড়ির উঠানে এসে পুরুষ মানুষদের বের হতে বলে। ওরা দু'জনে একসাথে পাশাপাশি মিলিটারিদের কাছে যায়। মুসাদা (হ্যান্ডশেক) করার জন্য হাত বাড়ানোর ভান করতেই পাশ থেকে একটা মিলিটারি গুলি করে। দু'জনই মাটিতে পড়ে যায়। এ দৃশ্য বাড়ির এক মহিলা রান্নাঘরে এসে আমাকে জানায়। আমি গুলির শব্দ যদিও শুনেছিলাম কিন্তু ঐ গুলিতে আমার স্বামী ও জামাই মারা গেল এটা বুঝিনি। আমি দৌড়ে রান্নাঘর থেকে বের হয়ে এলাম। মাটিতে পড়ে থাকতে দেখলাম স্বামীর লাশ। ওটা দেখেই আমি চিৎকার দিলাম। সাথে সাথেই আমি জ্ঞান হারাই। বাড়িতে আর কেউ ছিল না। আমার বয়সটাও ছিল কম। বেশি কিছু বলতে পারিনি। ভয় পেয়েছি, দূর থেকে দেখেছি মিলিটারিরা বাড়ি বাড়ি ঢুকে যাকেই পেয়েছে তাকেই গুলি করে মারছে। এভাবে চলেছে প্রায় দুই আড়াই ঘন্টা।

বেলা প্রায় ৪টার পর গ্রামে আশেপাশের গ্রাম থেকে লোকজন আসতে থাকে। তাও যাদের আত্মীয়স্বজন ছিল তারা কেউ কেউ আসে। দেখা যায় সোহাগপুর গ্রাম পুরুষশূন্য হয়ে গেছে। আমরা নিজেদের মানুষগুলো কোনোমতে টেনে একটা গর্ত করে সবার লাশ কবর দেই। আমার বাবাও আসেন। তিনি আমায় জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদলেন। আমার অবস্থা দেখে তিনিও আমার ন্যায় পাগলের মতো হয়ে গেলেন। মেয়ের সুখের জন্য বিয়ে দিয়েছিলেন সোহাগপুরে। সেই সোহাগপুরে মেয়েটি তিনদিন জ্ঞানহারা ছিল। বাবা চেষ্টা করলেন চিকিৎসা করাবেন কিন্তু সেই সময় কে আসবে চিকিৎসা দিতে? তবু বাবা কিছু ওষুধপত্রও পানি পড়ার ব্যবস্থা করলেন।

www.pathagar.com

হাজেরা বেওয়া
বয়স : ৮০
স্বামী : শহীদ সাহেব আলী

হাজেরা বেওয়ার বাড়িতে হাঁটতে হাঁটতে পৌছুলাম যখন তখন বিকেল হয়ে গেছে। তিনি ছিলেন পাশের বাড়ি। আমরা এসেছি শুনে তিনি একপ্রকার দৌড়ে এলেন। আমাদের মোড়া এগিয়ে দিলেন। আমরা তাঁর আতিথেয়তায় মুগ্ধ হলাম। এই বয়সও তিনি ঘটনার বর্ণনা যেভাবে দিলেন—বুঝলাম স্মৃতি তাঁর খুবি প্রখর। তিনি বলে গেলেন সেদিনের কথা—

শাওন মাসের ১০ তারিখ। সেদিন খুব সকালেই ঘুমটা ভাঙে। আমি সকাল সকাল হাত মুখ ধুয়ে রান্না করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। আকাশটা ছিল মেঘে ঢাকা। চারিদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে। খুব বৃষ্টি হবে বুঝলাম। আমার স্বামী আবহাওয়া এমন দেখে বিছানায় শুয়ে রইলেন। বললেন তিনি মাঠে যাবেন না। আমিও তাকে জোর করিনি। আমার কোলে তখন ২০ দিনের শিশু। পরে স্বামী এসে উঠানে বসলেন। উঠানে।

স্বামী হুক্কা চাইলেন। তামুক চাইলেন। বুন্দা চাইলেন। আমি সব এনেদিলাম। ঐসময় আমার শ্বশুর এলেন। তাঁকে পিড়া দিলাম বসতে। তিনি পান চাইলেন।

ছেলেকে তিনি কোলে নিয়ে বসলেন। ঘর থেকে পান এনে তাঁকে দিলাম। তিনি পান মুখে দিলেন। এসময় ছেলেটি তাঁর লুঙ্গি নষ্ট করে দেয়। শ্বশুর তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে কোলে নিতে বলে একটা লুঙ্গি চাইলেন। আমি লুঙ্গি এনে তাঁকে দিলাম। তিনি লুঙ্গি পরিবর্তন করে

www.pathagar.com

বললেন—লুঙ্গিটা ভাল করে ধুয়ে নেড়ে দাও। আমি তাই করলাম। বেলা হয়ে যাচ্ছে দেখে স্বামী বললেন, সকালে গরম গরম আজ খিচুড়ি করো। ঘরে চিকুন চাল আছে, কুমড়া আছে। মাসকলাই ডাল আছে। তুমি খিচুড়ি করো। এই বলে তিনি ঘরে চলে গেলেন। একটু পর তিনি চিৎকার দিয়ে বলে উঠেন, বউ তাড়াতাড়ি আসো, বাবা দেইখ্যা যাও। আমরা দৌড়াইয়া ঘরে গেলাম। ঘরের জানালা দিয়ে মাঠের দিকে তাকাইয়া দেখি মাঠে যেন আগুন লাগছে। খালি ধোঁয়া দেখলাম। তিনি কইলেন মাঠে এতো ধুয়া কিসের? আমার শ্বশুর কইলেন, লক্ষণটাতো ভালো লাগে না। তারা উঠানে দিয়ে বসলেন। আমি তাদের পাশে পাটাটা বিছাইলাম। মসলাপাতি বাটুম তাই।

আমার স্বামী আবার কইলেন উত্তর মুড়া দিয়ে যে ধুয়া দেখা যাইতাছে এই ধুয়া কিসের হইতে পারে বাজান? তিনি হঠাৎ ঘরে গিয়ে আবার ধুয়া দেখতে গেলেন। তখন কিছু শব্দও শুনলাম। তিনি যেন একটু চঞ্চল হয়ে গেলেন। বিষয়টা না বুঝতে পারায় একপ্রকার চিন্তায় যেন পড়েছেন তিনি। কেমন যেন একটা অস্থিরতা! আমার ভাইয়ের বাসা ছিল এ বাড়ির পেছনের দিকে। আমার শ্বশুর কিছু বলতে পারছেন না দেখে তিনি আমার ভাইকে ডাকলেন। বললেন, ভাই সাহেব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসুন। উত্তরদিকে আগুন ধরেছে। মনে হচ্ছে মিলিটারিরা আক্রমণ করেছে। এটা শুনে আমি এবার চিন্তিত হলাম।

আমার তখন তিনটা ছেলে। বড়টা ৮ বছরের মেজোটা ৬ বছরের। আর ছোটটা ২০ দিনের। আমার স্বামী সবাইকে ডেকে এক করলেন। তিনি বললেন কোনো চিন্তা কইরেন না। আল্লাহ আছেন। চলো পালাই। তিনি আমাদের সবাইকে সঙ্গে করে ক্ষেতের দিকে চলতে শুরু করলেন। এক কাপড়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। আমি তখনও গ্রামে নতুন। কোথাও তেমন যাই না। মাথায় কাপড় যতটুকু টানা যায়। আশেপাশে কিছু দেখি না। চোখ-নাক সব ঘোমটা দিয়ে ঢাকা। কোলে ছোট ছেলেটা। কিছুদূর যেতে যেতে আমি পড়ে যাই। স্বামী হাতটা ধরে রেখেছে। তার হাতে এক ছেলে। কোলের একটা। দ্রুত চলেছি। পড়ে গেছি বহুবার। ছেলেটাও ধরে রেখেছি। কষ্ট হচ্ছিল চলতে। কিন্তু মুখ দিয়ে তা প্রকাশ করিনি। হঠাৎ গুলি শুরু হলো

www.pathagar.com

মুষলধারে। স্বামী বলছিলেন, গুলির শব্দ শুনা মাত্র বসে পড়বে। তাহলে শরীরে লাগবে না। আমি কিন্তু কোনো গুলি দেখছিলাম না। গুলি যে দেখা যাবে না—এটা তখন বুঝতাম না। এমনভাবে পথ চলছিলাম। একসময় একটা ঘর দেখে সেই বাড়িতে তিনি আমাদের ঢুকিয়ে চলে গেলেন। সেই ঘরে ঢুকে দেখি দুনিয়ার মানুষ সেই বাড়িতে ভরা। এদেরকে কাউকে আমি চিনলাম না। সবাই অপরিচিত। কিছু সময় যেতে আমি স্বামীর জন্য উদগ্রীব হলাম। দরজায় দিকে বারবার দেখি। এতো দেরি করার কি দরকার? সময় যেতে থাকে। আমি চিন্তায় আর কুলকিনারা পাই না। কোথায় গেল কিছু হলো কি তার! আমি এরপর আমার চার ভাই ও তাদের ছেলেদের কথা ক'জনকে জিজ্ঞাসা করলাম। এরা সবাই গেল কোথায়? মাথার উপর তখন বেলা চলে এসেছে। আমি অনেক কান্নাকাটি করলাম। আমাকে এভাবে কান্নাকাটি করতে নিষেধ করা হচ্ছিল কিন্তু কি করবো। আমার যে মন মানছিল না। মাটিতে গড়াগড়ি করলাম। হঠাৎ আমার মেজো ভাই ঐ বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়। তিনি বললেন, বোন, আমাদের গষ্ঠী শেষ করে ফেলেছে। গষ্ঠী নাই! আমি ছোট একটা কোণায় লুকিয়ে ছিলাম। ওখানেও মিলিটারিরা গুলি করেছে। বলেছে একেও গুলি কর এও মুক্তি হতে পারে। গুলি করেছিল, কিন্তু আমি প্রাণে বেঁচে গেছি। সবাইকে মেরে তাদের লাশ রাস্তার উপর ফেলে রেখেছে। প্রায় বিকালের দিকে আমাকে নিয়ে মেজ ভাই রাস্তার ওপর আসে। দেখি আমার স্বামী, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, ভাইঝির জামাই, আরও গ্রামের অন্যান্য কয়েকজনার লাশ পড়ে রয়েছে। অনেক কষ্ট হলো স্বামীকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখে। স্ত্রী ও সন্তানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নিজে বুক পেতে গুলি খেলেন! হায়রে কপাল স্বামীটা আমার অনেক ভাল ছিল। এমন ভাল মানুষ পাওয়া যায় না। এতো কেঁদেছি—চোখের পানিতে জীবনটা চইলা গেল। ৭টা লাশ পড়ে ছিল পথের উপরে।

লাশগুলো দেখলাম। ভাইকে একটা গুলি করেছে। তিনি মারা গেছেন। আমার স্বামীকে একটা গুলি করে মেরেছে। ভাইঝি জামাইকে করেছে দুটি গুলি। বেলা চলে যাচ্ছে দেখে কোনোমতে আমরা এই তিনজনের লাশ বয়ে আনলাম। পরনের ঐ লুঙ্গিটা পরা

www.pathagar.com

অবস্থাতেই কবর দিলাম। মাটিতো দিলাম কিন্তু তারপরই ভয় হলো বাড়িতে কিভাবে থাকব? বাড়িতে তো পুরুষ মানুষ নাই। মেজ ভাই বললেন, বোন চলো ডা. আয়াত আলীর বাড়ি যাই। তিনি বললেন, পরিবেশ ভালো হলে আবার বাড়িতে আসা যাবে। আমি সেই বাড়িতেই গেলাম। রাতটা পার করলাম সেই বাড়িতে।

সকাল বেলা মিলিটারিরা ঐ বাড়িতে আবারও এলো। এসেই মুক্তিবাহিনীর কথা জিজ্ঞাসা করলো। মুক্তি আছে। আমরা বললাম মুক্তি জানি না। চিনিও না। কিভাবে বলব? আমার বড়ো ছেলে বলল, স্যার আমার বাবা মামা আর মামাতো ছেলেদের তো মেরেছেন। আমাদেরকে মারতে পারেন। আমরা কারে লয়ে বাচুম স্যার।

মিলিটারি বলল, তোমাদের এখন মারব না। আগে বড়দের মারতে হবে। ছোটদের এরপর। তোমরা ঘরে যাও। বের হবে না। ঐ বাড়িতে রাতটা সেদিন থাকলাম। তারপর চলে গেছি অন্য গ্রামে। তবে যেখানেই গিয়েছি স্বামীকে প্রতিটি মুহূর্তে মনে পড়েছে। আজও তেমনি মনে পড়ে।

www.pathagar.com

ফাতেমা বেওয়া
বয়স : ৬৫
স্বামী : শহীদ আইয়ুব আলী মুন্সি

সোহাগপুরে আমরা বেশ কয়েকমাস কাজ করেছি। একদিকে নিজস্ব কাজ তার উপর বিশেষ এই কাজ। আমরা সপ্তাহের দুটি দিন কাজ করতে পেরেছি। ফাতেমা বেওয়ার বাড়িতে সেদিন গিয়েছি সেদিন তিনি আমাদের অপেক্ষায় বাড়ির সামনের রাস্তায় ছিলেন। সাথে গ্রামের আরও তিনজন। তারাও বিধবা। আমাদের জন্যই অপেক্ষা। আমরা একটা নিরিবিলি জায়গায় বসলাম। মোড়া ও টুল পেলাম। তিনি গাছ থেকে ডাব পাড়তে বললেন। আমরা খেলাম। এরপর আমরা প্রস্তুতি শেষ করে শুরু করলাম সাক্ষাৎকার পর্ব। তিনি বললেন—

আমার স্বামী ফজরের নামাজ পড়ে হাল নিয়ে মাঠে যায়। এদিকে আমিও উঠে নামাজ পড়ে রান্নাঘরে যাই। কিছু রান্না চড়াই। কারণ মাঠ থেকে তিনি ফিরে খাবার খাবেন। ভাত চড়াবার পর পরই মনে হলো চারদিক থেকে শব্দ আসছে। এমন শব্দ আগে কখনো শুনিনি। আমি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে স্বামীর ছোট ভাইকে পেলাম। সে বলল ভাবী এগুলোতো গুলির শব্দ। ক্রমেই কাছাকাছি এসে পড়ছে। দেবর বলল, ভাবী আপনি মাকে নিয়ে দক্ষিণের দিকে চলে যান। আমার কাছে বিষয়টা ভাল মনে হচ্ছে না। আমি আর শাশুড়ি কিছু জামা কাপড়-চাদর, কিছু টাকা-পয়সা নিয়ে দক্ষিণের দিকে রওয়ানা দিলাম। পথে জরিতনের এক নাতিন আমাদের দেখে বলল, আপনি চলে যান। ফুফু আপনি থাকলে ফল কি হয় বলা যায় না। আমার শাশুড়ি সে কথা শুনে রয়ে গেলেন। আমি চলে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালাম। ঐ সময় দেখি আমার স্বামী আরও চারজন লোক একত্র হয়েছে। তারা হাল

www.pathagar.com

ছেড়ে দিয়েছে। একত্রে তারা বাড়িতে চলে আসছে। তাদেরকে এভাবে চলে আসতে দেখে আমিও দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার স্বামী ঘরের দাওয়ায় এসে দাঁড়ালেন। অন্যরা উঠানে দাঁড়াল

এরপরই দেখি মিলিটারিদের। তারা আমাদের বাড়ির উঠানে এসে কি যেন জিজ্ঞাসা করলো। আমার স্বামী সালাম দেয়। কিন্তু ওরা তাঁর সালাম নিল না। ছেলেমেয়েরা কথা জানতে চাইল। ওরা বুঝতে চাইলো বাড়িতে যারা রয়েছে তারা প্রকৃত অর্থে এ বাড়ির কিনা। স্বামী বললেন দু-মেয়েই আমার। ও আমার স্ত্রী। পরিবার। জরিতনের স্বামীকে দেখা যায়। তাকে ডাকতে বলল। আমার স্বামী মামা মামা বলে ডাকলেন। একে একে সবাই তখন উঠানে দাঁড়াল। ছয়জন পর পর দাঁড়াল। হঠাৎ কিছু বুঝে উঠার আগেই কে যেন গুলি করল। আমি পাশে ছিলাম। চিৎকার দিয়ে বসে পড়ি। কান চেপে ধরি। দেখি একজনের উপর একজন পড়ছে। কেউ ছিটকে পড়ছে লাফ দিয়ে যেন পড়ছে। আর কি রক্ত! আমি বেহুশ হয়ে গেলাম। কেন মেরেছিল জানি না। বাচ্চাকে ছেড়ে দিলাম। আমার কথা বলার শক্তি ছিল না। চেয়ে চেয়ে দেখলাম শুধু। পাকিস্তানি মিলিটারিরা প্রায় ঘন্টাখানেক এখানে ছিল তারপর সব দল বেঁধে চলে যায়। চলে যাওয়ার সময় পথে যাকেই পেয়েছে তাকেই গুলি করে হত্যা করে ওরা। এদিকে আমি দু মেয়েকে নিয়ে এই অবস্থায় সারাদিন এতোগুলো লাশ নিয়ে বসে রইলাম। তারপর ধীরে ধীরে একটু স্বাভাবিক হবার পর আমি যে লাশগুলো একটার উপর আর একটি পড়ে ছিল সেই লাশগুলো ঠিক করে রাখলাম। নামিয়ে রাখলাম মাটিতে। স্বামীর লাশটা চিত করে রাখলাম। স্বামীর একটা চাদর ছিল, সেই চাদরটা এনে তাঁকে ঢেকে দিলাম।

বেলা প্রায় ৩-৪টার সময় আমি আমার স্বামীকে গোসল করাই। একটা সাবান ছিল সেই সাবান দিয়ে গোছল দেই। তারপর দেবরের একটা চাদর দিয়ে কাফন ছাড়াই। আহ্‌হারে খোদা! এমন কোনোদিন অবিনি মানী দাদীদের কাছে কোনোদিন পল্ল শুনিনি। এমন কপাল আমার স্বামীকে করব দিলাম এই হাত দিয়ে। এ কেমন ইতিহাস?

সন্ধ্যার পর এবাড়ি ওবাড়ি যারাই জীবিত ছিল সবাই একত্র হলাম। তারপর হাজি মুন্সির সহযোগিতায় আমরা নদী পার হয়ে

www.pathagar.com

গোপালপুর চলে যাই। শুনেছি পাকিস্তানি মিলিটারি ও বদর বাহিনীর সদস্যরা ২/ ৩ দিন পর এখানে এসে মুক্তিবাহিনীর খোঁজ করেছে। কি করব ফিরতে চাইলেও পারিনি। তারপর আমাকে থাকতে হয় নকলায় স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত। স্বামী পড়ে রইলেন সোহাগপুর। সময় পেলেই স্বামীর কবর পরিষ্কার করি। মাঝে মধ্যে স্বামীর কবরের পাশে বসে থাকি। কথা বলি অনেক। কিন্তু স্বামী কোনো কথা বলে না!

www.pathagar.com

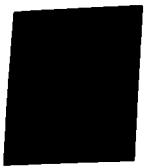

জরিতন বেওয়া

বয়স : ৭০

স্বামী : শহীদ খেজুর আলী

জরিতন বেওয়ার বাড়িটাও জরাজীর্ণ. কোনো-রকম চাল-চুলা চলে ওর। এসব পরিবার রাজধানী থেকে এতদূর থাকে—যে কারণে এখানে তেমন কোনো সাহায্য সহযোগিতা পৌঁছেনি। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর দুই হাজার টাকা দিয়েছিলেন—এটা এঁরা বললেন। জরিতন বেওয়ার কাছে জানলাম তার জীবনের সেই ঘটনা। তিনি বললেন এভাবে—

সকালবেলা আমার স্বামী হাল নিয়ে মাঠে যায়। সাথে দুইজন কামলা ছিল। যাওয়ার সময় বলে গেল আবুল হোসেন নাতিকে দিয়ে কোদালটা যেন পাঠিয়ে দেই। আমি বললাম, আজতো মিলিটারি নামবে। দশটা পর্যন্ত বের হওয়া নিষেধ। উত্তরে তিনি বললেন, আমরাতো চোর-ডাকাত না, লুটপাট করিনি। এই বলে তিনি চলে গেলেন। তারপর আমি আমার ১৪ বছরের মেয়েকে তাকে বললাম, চুলায় ভাত চড়িয়ে দিতে। ও ভাত চড়াতে গিয়ে দেখে আগুন নেই। সে বলে, মা চুলাতে তো আগুন নেই। দেখি সত্যি চুলায় আগুন নেই। আমি পাশের বাড়ি থেকে আগুন আনতে গেলাম। ও বাড়িতে একজন বুড়ি মা থাকতেন। ও সময় কানে একটা গুলির শব্দ পেলাম। ঐ বুড়িও গুলির শব্দ শুনল। তিনি বললেন, তার ছেলেটা মাঠে গেছে কি যে হয়। আমিও বললাম আমার স্বামী আর ছেলেও মাঠে গেছে। আমি বাড়িতে চলে এলাম। বাসায় এসে মেয়েকে বললাম, মারে তুমি মাঠে যাও। তোমার বাজান আর ভাইকে বলে আস যেন তাড়াতাড়ি বাড়িতে চলে আসে। মেয়েটি মাঠে দৌড় দিয়ে গেল : কিছুক্ষণ পর তারা ঐ গুলির মধ্যে বাড়িতে এসে পড়ে।

www.pathagar.com

তারপর যে ঘটনা ঘটল সেটার জন্য আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। গ্রামের কাদীর নামে এক লোক, সে পাঞ্জাবী ফৌজদের সাথে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হয়। ফৌজরা বাড়ির বাইরে ছিল। কাদির এসে বলে বাড়িতে যারা আছেন তারা বাইরে চলে আসেন। বাড়িতে তখন ছিল সাতজন। ঐ সাতজনই একত্রে বাইরে বেরিয়ে যায়। আমার স্বামীর কোলে তখন মেয়েটা ছিল। স্বামী বাইরে যেতেই তারা ছয়টা গুলি করে। আমার স্বামী মেয়েকে কোলে নিয়ে তখনও দাঁড়িয়ে আছেন। সাত নম্বর গুলি করার পর তিনি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননি। তিনি পড়ে যান। ঐ মুহূর্তে দুজন মিলিটারি ছোট মেয়েকে ছুড়ে ফেলে।

আমার শাশুড়ি দৌড়ে যান। তিনি ছোট্ট মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে বলেন, কোন গোলামের পুত একাজ করল, আমার নাতিকে এভাব ছুড়ে কে ফেলল? কে ফেলল? ওরা মানুষ মেরে পাশে একটা দিঘি ছিল সেটায় গিয়ে বসে রইল। আমরাতো উঠানেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। সে সময় আমার ছেলে এসে বলে মা আপনি ঐ বাঁচা ঘাড়ের নিচে একটা কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকেন। নড়াচড়া করবেন না। শব্দ হলে ওরা গুলি করতে পারে। এ চলে যাবে ছেলে আমি তাকে বললাম, বাবা তুমি গুলি কোথায় যাও। ও বলে, আমিও পালিয়ে যাচ্ছি। সাথে আরও একজন মহিলা ছিল সেও বলে, তুমি চিন্তা কইরো না।

বাড়ির পাশে ছিল মালেক ফকিরের বাড়ি। মিলিটারিরা তাকে দেখা মাত্র ডাক দিল। আমি বাঁশঝাড়ের নিচে শুয়ে ছিলাম। বেশি দূরত্ব নয়। কাছাকাছি। আমি স্বামীকে দূরে রাখতে চাইনি বলে বাঁশঝাড়ের নিচেই থাকলাম। মালেক ফকির কাছে গিয়ে দাঁড়ায় উর্দুতে কে যেন কি বললো। মনে হলে ঐ কথা বলার মুহূর্তে তাকে কয়েকটা গুলি করে। তার হাতের ২টি আঙুল ছিড়ে আমার পিঠে এসে পড়ল। তাও আমি নড়িনি। এদিকে মিলিটারিরা দিঘির পাড়ে বসেই রয়েছে। আমি আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। খুব সাবধানে উঠে এলাম। আমার শাশুড়ি পানি খেতে চাইল—তাকে ওরা পানি খেতে দিল না। আমার ছেলেটা আবার এলো। আমাকে দেখে বলে, আপনি এখনও দাঁড়িয়ে আছেন? আপনাকে না বললাম, লুকিয়ে থাকতে। ছেলেটি আবার চলে যায়। উত্তরের দিকে বাড়িতে গিয়ে সে আশ্রয় নেয়।

www.pathagar.com

ওদিকে মিলিটারিরা উঠে দাঁড়ায়। ওরা অস্ত্রসহ পশ্চিম দিকে যেতে থাকে। সাথে তাকে রদর কাদির। মিলিটারিরা যেতে দেখে আমার ছেলেটা পশ্চিম দিকে ঘুরে আবার আমার পাশে এসে দাঁড়ায়। ছেলেটা দেখে মিলিটারিরা আমার দিকে আবার আসতে থাকে। আমার শাড়ির আঁচলে ছেলে ঢেকে রাখার চেষ্টা করি। কখনও বুকে চেপে ধরি কখনো পেছনে লুকাবার চেষ্টা করি। মিলিটারিরা বলে মেয়ে লোককে মারব না। তোমার কোনো ক্ষতি করব না। ছেলেকে দিয়ে দাও। নতুবা ক্ষতি হবে। ছেলেটি মা-মাগো বলে চিৎকার করতে থাকে। আমি ওদের সাথে কিভাবে পারি। অতোগুলো ফৌজ।

ওরা দুজন আমার দুহাত ধরে টেনে ধরে রইল। একজন এসে ছেলেকে ধরে দূরে নিয়ে দাঁড় করাল। আমার ছেলেটা বাঁচার জন্য কত অনুরোধ করল। ওরা শুনল না। ওরা গুলি করল। ওর পেট ফেটে নাড়িভুড়ি বেরিয়ে যায়। ও ছিটকে পড়ে গেল। একদিকে স্বামী হারানোর ব্যথা, এবার ছেলেকে এভাবে হারান, আমি আর ঠিক থাকতে পারলাম না। হাউমাউ করে কাঁদলাম কিছুই বলতে পারলাম না।

আমার দুজন ভাতিজা ছিল। ওরা নকলায় এসেছিল বাজার সদাই করতে—বাজারে এসে শোনে সোহাগপুরে নকলা থেকে যারাই এসেছিল তাদের সবাইকে মিলিটারিরা হত্যা করেছে, এটা শুনে তারা আমার খোঁজে এসে দেখে সত্যি সত্যি শেষ। তারপর ওরা আমাদের খুঁজে পায়। ওদের সাহায্যে আমার স্বামী, দেবর, ভাসতি জামাই ও ছেলেকে কবর দেই। অনেক কাঁদলাম। কোনো গোছল নাই, কাফন নাই—এক কাপড়ে ওদের কবরে রেখে এলাম। মনটা খারাপ ছিল তাই কোনো মালপত্র নিতে পারিনি। এভাবেই ওরা আমাকে রাতের আঁধারে নিয়ে যায়। আমি দুই ভাতিজাসহ তিন মেয়ে ও দুই ছেলে সবাই ছোট ছোট ছিল। এদের নিয়ে বের হই। কারা যেন এক-সের খানিক চাল দিয়েছিল, সেটাই আচল থেকে বের করে করে এদের দিয়েছি খেতে—ওরা সারা পথ সেগুলোই চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছে। এখানেই একটি গ্রামে পথ চলতে চলতে কয়কুলিম তার বোন ও উনাদের সাথে দেখা হয়েছে। তারা বলল তাদের স্বামী হারানোর কথা। আমিও বললাম আমার জীবন কাহিনী। সবাই কাঁদি আর শুনি শাওন মাসের সেই সকালের কথা।

www.pathagar.com

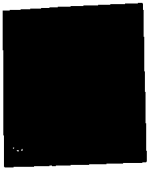

হাজেরা খাতুন
বয়স : ৫০
স্বামী : শহীদ ইমান আলী

আমরা হাঁটতে হাঁটতে হাজেরা খাতুনের বাড়িতে যখন পৌঁছুলাম তখন প্রায় দুপুর। তিনি আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে চাইলেন। কিন্তু আমরা এ অবস্থায় খাব না—বিনয়ের সাথে তাকে জানালাম। তিনি লেবু শরবত করলেন—এটা না খেলে ঠিক হবে না ভেবে ইউনিটের সবাইকে খেতে বললাম। পানি খেয়ে শুনতে বসলাম হাজেরা খাতুনের একাত্তরের সেই ভয়াবহ দিনের স্মৃতিকথা। তিনি বললেন—

শাওন মাসের ১০ তারিখ সকালে বাড়িতে কাজ করছিলাম। আমার স্বামীও কামলার কাজ করত। সকালে যখন মাঠে যাবেন ঐ মুহূর্তে তিনি আমাকে ডেকে বললেন, তুই তোর বাপের বাড়ি যেতে পারবি না? আমি শুনে অবাক হলাম। বললাম, আপনি এসব কি বলেন। তিনি তারপর বললেন, বললাম একা একা চিনে যেতে পারবি না? আমি আবারও বললাম আপনি এসব কি বলেন? আমি একা বাপের বাড়ি যাব কেন? তিনি বললেন গ্রামে মিলিটারি নামতে পারে। কি হয় বলা যায় না।

সকাল ৮টার দিকে গ্রামে মিলিটারিরা প্রবেশ করে। প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ শুরু হলো। চারিদিকে চিৎকার চেঁচামেচি। লোকজন দৌড় দিয়ে পালিয়ে যেতে শুরু করে। কেউ ক্ষেতে পালায়, কেউ ঘরে লুকায় ঠিক নেই। আমি শুধু অপেক্ষায় থাকি স্বামী কখন ফিরবে। স্বামীকে ছাড়া এ বাড়ি থেকে নড়া যাবে না। আমি অপেক্ষায় থাকলাম। পরে সকাল ১০টার পরে খবর এলো—মাঠের কেউ বেঁচে নেই। সবাইকে মেরে ফেলেছে। শুনলাম সাতজনকে ওরা লাইনে দাঁড়

www.pathagar.com

করায়—তারপর গুলি করে। আমরা তখন বাড়ি ছেড়ে চলে যাই। ঘন্টাখানেক পর আবার বাড়ি ফিরে আসি। বেলা ১২টার পর আমার স্বামীর লাশ মাঠ থেকে নিয়ে আসা হয়।

ওদিকে মিলিটারিরা সোহাগপুর, দক্ষিণ সোহাগপুর, কাকরকান্দি মানুষ মেরে ওরা আবার ফিরে আসে। যেখানে লাশ পড়া ছিল সেখানে ওরা লাশগুলো নেড়েচেড়ে দেখে—কেউ বেঁচে রয়েছে কিনা। পা দিয়ে লাশগুলো সরিয়ে সরিয়ে দেখেছে ওরা। ভেবেছি এরা কি মুসলমান? মরা মানুষকে এভাবে পা দিয়ে কি কেউ অমর্যাদা করতে পারে?

আসরের সময় আমরা লাশ কবর দেওয়ার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকি। আমি অনেক বিহারীকে দেখেছি। ওরা উর্দুতে কথা বলছিল। মিলিটারিদের সাথে ওরা ছিল। ওদেরকে ভয় করছিল। ওরা চলে যেতে আমরা কবর দেই। খুব সামান্য গর্ত। যতদূর কাজ করা যায়—কোনো রকম হাঁটু পর্যন্ত গর্ত করতে পেরেছিলাম। স্বামীর লাশটা দেখলাম পুরো শরীর গুলিতে ঝাঝরা হয়ে গিয়েছিল। মনে হলো সুই ঢোকানোর জায়গাটুকুও নেই। পরে শুনেছি ওদের লাইনে দাঁড় করিয়ে বলতে বলা হয়েছিল বল পাকিস্তান জিন্দাবাদ। কিন্তু ওরা বলেনি। মিলিটারি বলে—তোরা তাহলে মুক্তি? নিশ্চয়ই কোথাও রাইফেল লুকিয়ে রেখেছিস। ওরা বলেছে, আমরা মুক্তি না। হাল চাষ করি। আমরা কৃষক। ওরা শোনেনি। ঠিকই গুলি করে। তারপর সন্ধ্যার পর ঠিক হলো, আমরা ভারতে চলে যাব। এখানে থাকা যাবে না। সবাই যারা বেঁচে ছিল তারা প্রত্যেকে যে যা পারল কিছু কিছু নিল। আমিও নিলাম। হাঁটতে হাঁটতে প্রায় অর্ধেক পথ অতিক্রম করার পর শোনা গেল—ভারতে যাওয়া যাবে না। খবর পাই এ পথে ওর আগে আরও একটা দল—এ পথেই ভারতে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। মিলিটারিরা ঐ পথেই পাহারা বসিয়েছে। ঐ দলকে ওরা মেরে ফেলেছে। এই খবর শুনে আমরা আবার ফেরত আসি। এরপর যে যার মতো করে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ি। ভারত আর যাওয়া হয় না।

www.pathagar.com

লাকজান বেওয়া
বয়স : ৫০
স্বামী : শহীদ শমশের আলী

হাতে একটা লাঠি ভয় করে হেঁটে এলেন লাকজান বেওয়া। আমার জীবনের সবচেয়ে এটাই হয়তো মর্মস্পর্শি ঘটনা। এতো নিখুঁতভাবে তিনি তার ঘটনা বর্ণনা করেন, যে কারো হৃদয় কেঁপে উঠব। চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়বে পানি, কণ্ঠ হয়ে উঠবে ভারী। লাকজান বেওয়ার ঘটনাটি এরকম—

২৫ জুলাই, ১৯৭১ ভোরে উঠে তিনি ফজরের নামাজ পড়েছেন। তারপর গরুদের পরিচর্যা করেছিলেন। স্বামী হাল নিয়ে মাঠে যাবেন—তারই প্রস্তুতি তিনি করছিলেন। মাঠে যাবার পূর্বে তিনি আমাদের বললেন, বেগম নাস্তা তৈরি করো। আমরা মাঠে গেলাম। তারা মাঠে চলে গেলে আমরা বাসি কাজ সেরে রান্নাঘরে গেলাম নাস্তা বানাতেন নাস্তা তৈরি করছি। হঠাৎ দেখি স্বামী হাল ছেড়ে মাঠ থেকে চলে এসেছেন। স্বামীকে দেখেই প্রশ্ন করলাম, হাল ফেলে চলে এলেন কেন। তিনি বললেন মাঠে মিলিটারিরা এসে মানুষ মেরে ফেলছে! আজ আর বাঁচা যাবে না। এ জন্য হাল ছেড়ে চলে এসেছি। আমি বললাম, হাল ছেড়ে চলে এসেছেন, আপনি কি মনে করেন আপনি বেঁচে যাবেন? আপনি তো মারা যাবেন। এক কাজ করেন আপনি ধানক্ষেতে পালিয়ে থাকেন। ঐ সময় মাঠে বেশ পানি ছিল। ডুব দিয়ে থাকলে কারোর বোঝার উপায় নেই যে কেউ লুকিয়ে রয়েছে। ঐ ধানক্ষেত বাড়ির কাছেই ছিল। তিনি শুনে বললেন, না-না ধানক্ষেতে লুকিয়ে থাকা যাবে না। এখানে নামলে আমাকে জোঁকে ধরবে। তিনি জোঁককে ভীষণ ভয় পেতেন। আমরা তাকে বারংবার অনুরোধ করলাম। তিনি কিছুতেই রাজি হলেন না।

www.pathagar.com

আমার একটা ১৪ বছরের মেয়ে ছিল। সেও তার বাবার কাছে গিয়ে বললো। শত অনুরোধ করল সে। কিন্তু তিনি গেলেন না। আমার শাশুড়ি এলো। সব শুনে তিনিও বললেন, ধানক্ষেতে লুকানোর জন্য। আমার ছেলের বউ এলো। সেও ধানক্ষেতে যাবার অনুরোধ করল। তিনি গেলেন না। উল্টো তিনি আমাদের পায়ে পড়লেন। তিনি বললেন, আজ লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। আজ বাঁচা যাবে না। আজ মেরে ফেলবে ওরা। ধানক্ষেতে যাব না। তিনি আমাদের হাত থেকে টেনে হিঁচড়ে ছুটে গেলেন। বললেন এক কাজ করো আমাকে অজুর পানি দাও। আমি বললাম অজু করলে কি আপনি বাঁচতে পারতেন? ওরা কি আপনাকে ছেড়ে দেবে? অজুর পানি আমি আপনাকে দেব না। অনেক অনুনয় বিনয় করলেন। তবু আমি দিলাম না। এরপর তিনি তার মায়ের কাছে গেলেন। অজুর পানি চাইলেন। শাশুড়ি পানি দিলেন না। এরপর তিনি ছেলে বউকে বললেন। পরে মেয়ের কাছে গিয়ে তিনি পানি চাইলেন। মেয়েটি বলল, বাজান তুমি ধানক্ষেতে গিয়া লুকাও। তুমি বেঁচে যাবে। তিনি মেয়েকে বললেন, মাইয়া তোমার পায়ে পড়ি। আমাকে অজুর পানি দাও। আজ আমাকে ওরা মেরে ফেলবে। তখন মেয়ে ঘর থেকে এক বালতি পানি এনে দেয়। সেই পানিতে তিনি অজু করেন। ঐ সময় আমি তাকে বলেছিলাম মাঠ থেকে যে পথে চলে এলেন তারাতো আপনাকে দেখেছে। এরা এসে আপনাকেতো মারবেই, আমাদেরকেও মারবে। তাই বলছিলাম আপনি পালিয়ে যান। অন্তত আমাদের সন্তানগুলো বাঁচান। তিনি বললেন, আজ আর বাঁচা যাবে না। আমি মরেই যাব। যদি মরতে হয় ঘরেই মরব—এই কথা শেষ হতে না হতে পাকিস্তানি মিলিটারিরা বাড়ির উঠানে এসে পড়ে।

তিন মাসের একটা সন্তান কোলে করে ঘরের দরজার কাছে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। বেশ কয়েকজন মিলিটারি। বিভিন্ন জায়গায় তারা সতর্ক প্রহরায় দাঁড়ায়। এক মিলিটারি কর্কশ গলায় আমাকে ধমক দেয়। বলে এই মহিলা দরজা থেকে সরে দাঁড়া। ঘরে আমার বন্ধু রয়েছে। একে বের হতে বলো। আমি বলি, না না এখানে কোনো বন্ধু নাই। একথা শুনে ঐ মিলিটারি আমার কাছে এগিয়ে এসে আমাকে ডান হাত ধরে টেনে নিচে ফেলে দেয়। আমি টাল সামলাতে না পেরে

www.pathagar.com

মাটিতে ছিটকে পড়ে যাই। ঐ সময় আমার স্বামী ঘর থেকে হাত জোড় করে বেরিয়ে আসে। পাঞ্জাবি তাকে ধমক দিয়ে বলে, বন্ধু সিদা হও, সিদা হও। কোনো ভয় নাই। তখন সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। নামাজ পড়ার ভঙ্গিমায় হাত বেঁধে দাঁড়ায়। আর তখনি ঘরের দুয়ারে পাঞ্জাবি তাকে গুলি করে।

ঐ গুলিতে ওর হাত বুক ছিদ্র হয়ে যায়। বুকটা এমনভাবে ফেটে যায় যেন কলিজা ছিঁড়ে কাঁপতে থাকে। ঐ অবস্থা দেখে আমরা চিৎকার করে উঠি। ওরা বলতে থাকে, খবরদার কোনো চিৎকার চেঁচামেচি না। মেরে ফেলব। জীবনের ভয়ে আমরা কোনো শব্দ করতে পারিনি। শুধু চেয়ে দেখলাম ওরা আমার কিভাবে অপমান করল। কিভাবে আমাদের আপন মানুষ স্বজনদের হত্যা করল।

আমার চার ছেলে, শাশুড়ি, ছেলে বউ—সবাই জড়ো হয়ে রয়েছে। সবাই একে অপরকে ধরে রেখেছে। পাঞ্জাবিরা আমাদেরকে দেখে কৌতুক করল। ঠাট্টা করে বলতে থাকে—পাখি মেরে ফেলেছি। এ বাড়ির পাখি আজ মেরে ফেলেছি। একথা বলতে বলতে পাঞ্জাবির দল ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে চলে গেল।

ওরা চলে যেতে আমার মেয়েটি বলে ওঠে মা তুমি আমার বাবাকে পানি দাও। বাবা দেখো কেমন করছে। বাবার বুকটা শুকিয়ে গেছে। বাবা পানি খাবে মা। আমি বললাম, ওরা তো তোর বাবাকে মেরে ফেলেছে। আর পানি দিয়ে কি হবে? তারপরও মেয়েটি আমাকে পানি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করতে থাকে। আমি ঘর থেকে একটা জগে করে পানি এনে ওর গালে ঢেলে দেই। কিন্তু যার জীবন নেই সে কিভাবে পানি খাবে? দুগাল বেয়ে পানি পড়ে যায়। পানি গড়িয়ে পড়ে যেতেই আমার 'হুশ' হয়। আমি তখন ভাবলাম, আমার স্বামী ছিলেন বৃদ্ধ। তাকে পাঞ্জাবীরা মেরে ফেলল তাহলে আমার ছেলেকে তো ওরা বাঁচিয়ে রাখবে না। এটা ভাবতেই আমি আমার স্বামীর লাশ ফেলে মাঠের দিকে ছুটে গেলাম। কিন্তু মাঠ পর্যন্ত আমার যেতে হয়নি। পথেই তারও লাশ আমি পড়ে থাকতে দেখলাম। জওয়ান ছেলেকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে ভীষণ কাঁদলাম। অনেকক্ষণ কাঁদলাম। ভাবলাম এমন শাস্তি খোদা তাকে দিলেন কেন?

এক সময় লাশটা বাড়ির দিকে নিয়ে যাওয়ার চিন্তাটা মাথায় এলো। কিন্তু ছেলের লাশ আমি নড়াতেই পারলাম না। একদিকে

www.pathagar.com

স্বামীর মৃত্যু অন্যদিকে ছেলের লাশ সব মিলিয়ে আমি খুবই চিন্তায় ছিলাম। কি করব ভাবছি। এমন সময় আমি ছেলেরই দু'জন বন্ধুকে পেলাম। তাদের অনুরোধ করে লাশ বাড়িতে নেওয়ার ব্যবস্থা করলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, ছেলের মুখ দিয়ে ঘের ঘের ঘের শব্দ বের হচ্ছে। ছেলের মাথাটা কোলে তুলে নিলাম। অনেক কথা বললাম। কিন্তু ছেলে চোখ মেলে না। কথাও বলে না। ঘের ঘের শব্দ হচ্ছে। দেখলাম বুক পেট হাত পা কোথাও বাদ পড়েনি। সব স্থানেই গুলির চিহ্ন। সাতটা গুলি খেলেও ছেলের জীবন যায়নি। আসলে ছেলেটি খুবই ভাগ্যবান ছিল।

এদিকে আমার মেয়ে দেখে বাড়ির অন্যান্যরা বেরিয়ে আসে। তারা এসে দেখে আমি ছেলের লাশ নিয়ে বসে আছি। ওরাও কান্নাকাটি করল। চার মেয়ে বউ, শাশুড়ি মিলেও লাশ টেনে বেশি দূর নিয়ে যেতে পারিনি—এক সময় ভাবলাম বাড়িতে স্বামীর লাশ ফেলে এসেছি যদি কুকুর শিয়াল আসে! সবাই দৌড়ে বাড়িতে চলে যাই। এতো রক্ত! আর পুরো বাড়ি ধোয়া হয়ে গেছে। গুলির ধোয়ায় চোখ সবারই জ্বলছিল। মনে মনে ভাবছিলাম কাউকে পেতাম যদি? তাকে দিয়ে দুজনার লাশ একসাথে আনতে পারলে কাজ হতো। চোখের সামনে দুটো লাশ থাকলে আর কোনো ভয় থাকত না।

যা হোক, ঐ দুছেলের সহযোগিতায় ছেলের লাশ টানতে টানতে ঘরে আনলাম। বিকাল পর্যন্ত আমরা ঐ লাশ নিয়ে বসে রইলাম। আমাদের তো মানুষ ছিল না। কে মাটি দেবে? কাঁদি আর ভাবি—আজ আমার স্বামী ছেলের লাশ শিয়াল এসে খেয়ে ফেলবে। বেলা যেন দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছে। বেলা যতই এগিয়ে যায় ততই চিন্তা বাড়তে থাকে। এমন-ভাবে সন্ধ্যা এক সময় পুরো সোহাগপুরে নেমে আসে। আজান হবে যে কোনো সময়। আল্লাহর অশেষ কৃপায় আমার এক মেয়েকে বিয়ে দিয়েছিলাম। তার স্বামী ছিলেন ওপারে (ভারতে)। সে এসে হাজির হলো। তাকে দেখে আমরা কাঁদলাম। সবাই কেমন একটা সাহস পেলাম। সে কোদাল নিয়ে একটা কবর খুঁড়ল। পাশের বাড়ির উঠানে ছিল মেয়েদের লাশ। তিনটা লাশ এনে আমরা কবর দিলাম। তারপরের দিনগুলো যে কিভাবে গেছে সেটা আল্লাহই জানে একমাত্র। সেসব দিনের কথা আজ আর নাই বললাম।

www.pathagar.com

ওজুবা

বয়স : ৭০

স্বামী : শহীদ হাতেম আলী

ওজুবা আজও স্বামীর জন্য অপেক্ষা করেন। ভাবেন তিনি হয়তো ফিরে আসবেন। স্বামীর কবরের পাশে বসে ভাবেন, মানুষটা কেন অসময়ে চলে গেল। আমরা তাঁকে পেলাম, বসলাম পাশাপাশি। জিজ্ঞাস করলাম কিভাবে সংসার চলে? উত্তর দিলেন আল্লাহ চালায়। বললাম, নানী একটু বলবেন সেই ১৯৭১-এর ২৫ জুলাই-এর ঘটনা? তিনি বললেন, ঢাকা থেকে আইয়ুন কওনতো লাগবো। আমি মাইক্রোফোন বাড়িয়ে দিলাম। রেকর্ড হতে থাকল তাঁর কথা।

আমার স্বামী সোমবার রাতে কয়েকজন মুক্তিবাহিনীর সদস্য ঘরে এলে তাঁদের তিনি ভাত খাওয়ান। আমরা বুঝিনি ঘরের বাইরে রাজাকাররা লুকিয়ে ঘরের কথাবার্তা সব শুনছে।

মুক্তিবাহিনীর ঐ ছেলেরা অনেক ঘটনাই বলছিলেন। কিছু প্রশ্ন করলেন তারা। আমার স্বামী তাদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন। আমি ভেতরের ঘরে থেকে কথাগুলো শুনছিলাম। শেখ সাহেবের কথা শুনে খারাপ লাগল। তাকে জেলে বন্দী করা হয়েছে—এটা শুনে কষ্ট লাগল। তবু তিনি যে নির্দেশনা দিয়ে গেছেন—সেটা নিয়েই এরা যুদ্ধ করছে। এদিকে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা বিছানায় শুয়ে ছিল। আমি বসে রান্না করছি। আমার যতটুকু মনে আছে ওরা বলাবলি করছিল মুজিব নগর সরকার সম্পর্কে। এপ্রিল মাসে বলে ১১টা সেক্টর করা হয়েছে। ঢাকার খবরাখবরও ওরা বলল। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কথাও আলাপ হলো। গ্রামের মানুষ সম্পর্কে সাবধান করে ওরা বলেছিল অপরিচিত

www.pathagar.com

লোকজন দেখলে যেন খবর দেয়। আমি ওদের কথা শুনে এতটুকু বুঝলাম দেশ সমস্যায় রয়েছে। তবু ভয় নেই, কারণ ছেলেরা রয়েছে পাহারায়। আমাকে খাবার রান্না করতে বলা হয়েছিল। ভেতরের কথা শুনতে শুনতে ভাত, ডিম রান্না করলাম। তাই দিলাম। ওরা খেয়ে চলে গেল। রাত তখন গভীর।

স্বামী পরে বললেন, ওরা মুক্তিযোদ্ধা। প্রতিদিন ঐ পার থেকে এসে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। শহরে যায়। নানান খবর নিয়ে আবার ওপারে চলে যায়। এদের কাজ খবর সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের দেয়া। তারা ঐ সংবাদের উপর অপারেশন করে। গত ২ দিন তেমন করেনি। তাই আমি এদেরকে বাড়ি নিয়ে এলাম। আমি বললাম, কেউ দেখে নাইতো! তিনি বললেন, সাইকেল নিয়া হাঁটতে হাঁটতে এসেছি কে দেখবে—গ্রামের সবাইকে তো চিনি। যা হোক রাত পার করলাম।

মঙ্গলবার সকাল বেলা তিনি বলে গেলেন তুমি রান্না করো। গরম ভাত খাব না। নালিতাবাড়ি যাই। গরু কিনেই চলে আসার কথা ছিল। আমি গরুর ঘাস কেটে রাখলাম। তিনি নালিতাবাড়ি চলে গেলেন। এদিকে আমি রান্না করে অপেক্ষা করছি তিনি কখন আসবেন। সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে যায়। আমি তখন চিন্তায় এক প্রকার পাগল হয়ে গেছি। কোনো কাজই করা হয়নি। কাজে মনও নেই। পুরো বাড়ির কাজ বন্ধ। বিকাল হলে আমি এবাড়ি ওবাড়িতে খোঁজ নিলাম। কেউ স্বামীকে দেখেছে কি না। কেউ বলল—সকালের দিকে দেখেছিলাম। কেউ বলে কথা হয়েছিল, বলেছিল বউকে রান্না করতে বলেছি। বাজারে বেশিক্ষণ থাকার কথা না। এসব শুনে আমার ভয় হতে থাকল। গতরাতের কথা মনে হলো। মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের খাওয়ানোর কথা কি কেউ কোনোভাবে জেনেছে? জানাজানি হলে সর্বনাশ হবে এটা নিশ্চিত।

আসরের ওয়াক্তে খবর এলো আমার স্বামীকে বিহারীরা ধরে নিয়ে গেছে। কোথায় নিয়েছে, কি করবে, কেন নিয়েছে, কতক্ষণ পরে ছাড়বে—এসব কেউ বলতে পারল না। গ্রামের অনেক মুরব্বি এলো। তারা প্রত্যেকেই বললেন হাতেম আলীর তো দোষ ছিল না। কোনো শত্রুও তার নেই। খুব ভাল মানুষ তিনি। তাকে কেন ধরা হলো। লোকজন যারাই এসেছিল প্রত্যেকেই একে একে রাত বাড়ার সাথে

www.pathagar.com

সাথে চলে গেল। পুরো বাড়িতে আমি একা। অল্প বয়স। কোথায় যাব? রাতের প্রতিটি প্রহর গুনেছি। দারজা বন্ধ থাকলেও স্বামীর দেখা পেতে উদগ্রিব ছিলাম। ভেবেছি এই বুঝি স্বামী এলেন। মেঘলা আকাশ। বাতাসের শব্দ পর্যন্ত আমার কানে পৌছাচ্ছিল। কিন্তু প্রিয় স্বামীর কোনো খোঁজ এলো না—পুরো রাত। সকালে বিহারীদের উপস্থিতি টের পেলাম। তাদের শব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। দেখি জনা চার বাড়ির উঠানে। তারা আমাকে দেখে বলল, বাড়িতে আর কি মুক্তি আছে? ওদের এ জাতীয় প্রশ্নে কেন যেন মনে হলো আমার স্বামী আর নেই। আমি তাদের প্রশ্নের উত্তর ঐ মুহূর্তে দিকে পারলাম না। গলা ধরে এলো। ওরা আবার জানতে চাইল—বাড়িতে আর কোনো মুক্তি রয়েছে কিনা? আমি বললাম না আর কোনো মুক্তি নেই। আমি মুক্তিদের খোঁজ জানি না। পারলে আমার স্বামীর খোঁজ দেন। তিনিও নালিতাবাড়ি গিয়েছিলেন। আমার তো মনে হচ্ছে তাঁকে আপনারাই মেরে ফেলেছেন। মানুষটাকে মেরে আবার বাড়িতে এসেছেন কেন? এমন আরো কিছু কথা বললাম। ওরা এসব শুনে তেলেবেগুনে রেগে গেল। বলল, বেশি কথা বললে বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেব। তোমাকে মেরে ফেলব। একথা শুনে আমি আর কোনো কথা বলিনি। স্বামী মারা গেছে, আমার কারণে যদি সন্তানরা মারা যায় তাহলে এটা ঠিক হয় না। আমাকে বাঁচতে হবে, ওদেরকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। চুপচাপ থাকলাম। ওরা চলে গেলে আমি সন্তানদেরকে নিয়ে পালিয়ে যাই। বিভিন্ন বাসাবাড়িতে কাজ করেছি, ঘর লেপেছি, পানি টেনে দিয়েছি, গরুর ঘর পরিষ্কার করেছি। স্বামীর ইচ্ছা ছিল সন্তানরা যেন কোনোদিন কষ্ট না করে। আমি সেই চেষ্টাই করেছি। স্বামী ছাড়া আমার কেউ ছিল না। আজ ওরা বড় হয়েছে ভাল আছে। আমি স্বামীর কথা পালন করেছি—এটাই আমার আত্মতৃপ্তি।

www.pathagar.com

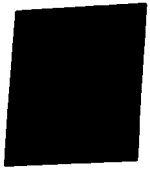

ছাহারা

বয়স : ৬০

স্বামী : শহীদ জহুরুদ্দিন

ছাহারাকে পেলাম বাড়ির উঠানে। গায়ে একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে ছিলেন। আমাদের সাড়া শব্দ শুনে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমি তাঁকে বসতে বললাম। একটা বিষয় খারাপ লাগল মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের বেশির ভাগ পরিবারের এমন দৈন্য দুর্দশা। খুবই নিম্নমান এঁদের জীবন প্রণালী। জীবিকা বলতে তেমন কিছু নেই। এক শহীদের স্ত্রী বলে চললেন সেই দিনের কথা—

২৫ জুলাই ১৯৭১। সকালে স্বামী হাল নিয়ে তাড়াতাড়ি মাঠে চলে গেলেন। বলে গেলেন ভাত রান্না করো। বাবা (শ্বশুর)কে দিয়ে ভাত মাঠে পাঠিয়ে দিতে বললেন। ঐদিন আবার বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দেওয়ার কথা রয়েছে। গত কয়েক দিন গ্রামে রটে গিয়েছিল মিলিটারিরা গ্রামে আসবে। তারা বাড়িঘর পুড়িয়ে দেবে এমন শোনা যাচ্ছিল। তিনি বললেন, মিলিটারিদের দেখামাত্র তুমি বাড়ি ছেড়ে চলে যেও। বাড়িতে থাকবে না। তিনি মাঠে চলে গেলে আমি সকালের সব কাজ করে রান্নার আয়োজন নিয়ে বসলাম। চুলা জ্বালিয়েছি—ভাত চড়াব কি তখনই গুলির শব্দ কানে এলো। একটা দুইটা নয় দশ পনের বিশটা গুলি। কখনও একসাথে। তখন খুব ভয় হলো। চিন্তা হলো স্বামীর জন্য। আমি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলাম—ঠিক কোন দিক থেকে গুলি হচ্ছে। ঠিক বুঝতে পারলাম না কোন দিক থেকে গুলি হচ্ছে। যাহোক গোলাগুলির শব্দে ভাত আর চুলায় দিলাম না। স্বামী যে বলে গেল বাড়ি পুড়িয়ে দেবে—এটাকি তারই আলামত?

www.pathagar.com

আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। এঘর ওঘর করলাম। বাড়ি থেকে চলে যেতেও মনটা চাইছিল না। স্বামী মাঠে, বাড়ি ফেলে কিভাবে যাই?

গোলাগুলি তখনও চলছে। মাঠ থেকে কয়েকজন লোক দৌড়ে গ্রামে এসে খবর দিলো মাঠে যারা রয়েছে তারা আর কেউ জীবিত নেই। সবাইকে মিলিটারিরা মেরে ফেলেছে। মাঠ থেকে যারা পালিয়ে গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে তাদের খোঁজে এখন মিলিটারীরা গ্রামে ঢুকবে। ঐ লোকগুলো সবাইকে ঘর বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলল।

দূর থেকে আমি দেখলাম মিলিটারি গ্রামের দিকে ঢুকছে। আমাদের এদিটায় ওরা আসেনি। ওদিকটায় চলে গেল। প্রায় তিন-চার ঘণ্টা পর গ্রামের লোকরা মাঠে চুপিচুপি যায়। পরিচিতজনদের লাশ তারা নিয়ে আসে। আমার স্বামীর লাশও পেলাম। কি কান্নাটাই না করেছি সেদিন। মনে হয়েছিল স্বামীর সাথে আমিও কেন সেদিন মাঠে গেলাম না। স্বামীকে একটা দানা খাবার দিতে পারিনি। সেদিন না খেয়েই তিনি মাঠে গিয়েছিলেন। একগ্লাস পানিও খেয়ে যেতে পারেননি। এতো রক্ত ঝরেছে তিনি হয়তো একটু পানি খেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কে কাকে পানি খাওয়াবে! স্বামীর লাশের পাশেই ছিলাম—আসরের পর তার লাশটা নিয়ে যায়। গ্রামের বহু মানুষ এসেছিল। মাস্টার বাড়ি হিসেবেই এ বাড়ির বিশেষ পরিচিত ছিল। পাকিস্তানি মিলিটারি বাহিনীর দৃষ্টি ছিল এ বাড়ির উপর। তারা বলত এটা মুক্তির বাড়ি। এটা নিশ্চিহ্ন করতে হবে। পুড়িয়ে দিতে হবে।

'৭১-এ আমার দুটি সন্তান। একটা কোলে আর একটা হামাগুড়ি দিয়ে হেঁটে বেড়ায়। ওরা তার বাবার কোনো স্মৃতিই পায় নাই। একটা ছবিও তার নাই। আমি ওদের বড় হলে কি দেখাব, কি শোনাব তাদের বাপের গল্প? শুধু ভেবেছি কিন্তু উত্তর পাইনি। তার লাশটা যদূর দেখা যায় আমি চোখের জলে তাকিয়ে দেখেছি। যে প্রিয় মানুষটা কঘণ্টা আগেও ছিল সে হঠাৎ করেই স্মৃতি হয়ে গেল!

আজও আমি অনুভব করি। অনেক মনে হয় তার কথা। মাঝে মধ্যে মনে হয় স্বামী এসে বলছে, কি বউ রান্না হয় নাই? আজ কি রান্না করছ? স্মৃতির পাতা থেকেই আমি শক্তি পাই। স্বামীর আত্মদানে দেশ স্বাধীন হয়েছে। তবে আমি এর বিচার চাই। স্বামী হত্যার বিচার দেখে যেতে চাই।

www.pathagar.com

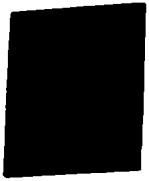

সাহেরা খাতুন

বয়স : ৮০

স্বামী : শহীদ হাসান আলী খান

সাহেরা খাতুনের বাড়ি আমার যাই প্রায় তিন মাস পর। মাঝে বাড়তার কারণে তার বাড়িতে যেতে পারিনি। এবার যখন তার বাড়ি গেলাম তখন কারুণিও ছিলেন আমাদের সাথে। আমরা সকাল ১০টার আগেই সেহেরপুর পৌঁছেছিলাম। সকাল বেলার রোদে গ্রামটি ঝলমল করছিল। আমি জানতে চাইলাম সেদিনের ঘটনাটি। তিনি বললেন এমন—

২৫ শুক্রবার, মাসবার।

সকাল বেলার কাজ হাল নিয়ে মাঠে গেলেন। যাওয়ার আগে ভাত খেতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমার রান্না হয়নি বলে তাঁকে ভাত দিতে পারিনি। তিনি বলে গেলেন তার ভাইকে নিয়ে যেন ভাতটা মাঠে পাঠিয়ে দেই। ভাত রান্না করে ভাসুরকে বললাম, মাঠে গিয়ে ভাত পৌঁছে দিতে। কিন্তু তিনি যাবে গেলেন না। তার শরীরটা ভাল ছিল না। আমিও সেটা দেখে তাকে জোর করিনি। ভাত আর মাঠে পাঠানো হলো না। হঠাৎ গোলাগুলির শব্দ পেলাম। ভাবলাম এমনি বুঝি। সকাল ১০টার দিকে খবর পেলাম বাড়ীই গোলাগুলি হয়েছে। অনেক লোক মারা গেছে। আমি অবিশ্বাস মুক্তিবাহিনীর সাথে মিলিটারিদের গুলি বিনিময় হয়েছে। তখন হয়তো কেউ কেউ আহত নিহত হয়ে থাকবে। কোন বাড়ির সাথে সাথে কারুকাটা মনে হলো বেড়ে গেল। পরে আমাদের থাকা মুক্তিবাহিনীর সাথে কোন গুলি বিনিময় হয়নি। মিলিটারিরাই নিরীহ কৃষকদের গুলি করে মেরেছে। কাউকে কাউকে পেটেই চর্ম করে মেরেছে। কেন এই হত্যাকাণ্ড তখন বুঝিনি।

www.pathagar.com

গ্রামের বেঁচে যাওয়া মানুষগুলো বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করল। আর আমি তখন চিন্তায় চিন্তায় অস্থির—স্বামীর লাশ কিভাবে আনব আমি কয়েকটি বাড়িতে দৌড়ে গেলাম। খোঁজ নিলাম কে জীবিত আছেন। কিন্তু যে কয়েকটি বাড়িতে গিয়েছি সাহায্যের আশায়—তারাও কাঁদছে স্বজন হারানোর ব্যথায়। আমি সব আশা হারিয়ে বহুকষ্টে মেয়ে, শাশুড়ি ও অপরিচিত লোকজনের সাহায্যে স্বামীর লাশ বাড়িতে আনতে সক্ষম হই। পরে শুনেছি আমাদের ক্ষেতে মিলিটারিরা পৌঁছে মুক্তিবাহিনীর খোঁজ জানতে চায়। কিন্তু আমার স্বামী বলেছিলেন তিনি জানেন না। ওরা আরও কি কি যেন জানতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি বলতে পারেননি সেসবের উত্তর। তারা সাতজনকে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে তারপর গুলি করেন। গুলিতে ওদের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। হৃদপিণ্ড পর্যন্ত বেরিয়ে গিয়েছিল।

ছেলে-মেয়েদের নিয়ে অনেক কষ্ট করেছি। গ্রামে তখন কোনো কাজ ছিল না। তবুও শত কষ্টেও এবাড়ি-ওবাড়ি কাজ করেছি। অভাবের মধ্যেই সময় গেছে। যার স্বামী থাকে না তারাই কেবল বুঝতে পারবে—স্বামীর অভাবটা কত কষ্টের। এটা কাউকে বলে বুঝানো যাবে না। তবে আজ কেন যেন মনে হয়—স্বামীকে কেন 'ওরা' মারলো? আমি আমার স্বামী হত্যার বিচার চাই। বিচার দেখেও যেতে চাই।

www.pathagar.com

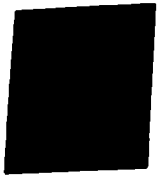

হাসেন বানু
বয়স : ৬০
স্বামী : শহীদ আবদুল লতিফ

হাসেন বানু ও তাঁর স্বামী দুজনই বাসাবাড়িতে কাজ করতেন। বাড়িতে কাজ করা এই পরিবারটির আর্থিক অবস্থা না বর্ণনা করলেও সকলেই বুঝতে পারেন—অতি দরিদ্র পরিবার। খুবই সাধারণ এই পরিবারটি রক্ষা পায়নি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে। তার সামনেও যখন মাইক্রোফোন বাড়িয়ে দিয়েছি তিনি বেশ কিছুক্ষণ কাঁদলেন, তারপর বললেন—

আমি আর আবার স্বামী দুজনই হাসান আলী খানের বাড়িতে কাজ করতাম। আমি বাড়িতে রান্না-বান্নার কাজ করি। আর স্বামী হাল নিয়ে হাসান ভাইয়ের সাথে মাঠে যায়। প্রতিদিনই কাজে যাই। সারাদিন কাজ শেষে বাড়িতে চলে আসি। গরিব মানুষের ঘর বাড়ি—কোনো রকম মাথা গোজা আরকি।

২৫ জুলাই ১৯৭১। আমার জীবনের প্রদীপ নিভে যায়। আমার সব স্বপ্ন ভেঙে যায়। আমার চোখের বাতি হারিয়ে যায়। আমি অন্যান্য দিনের মতো রান্নার জোগার করছি—সবার রান্না চড়িয়েছি। সাহারা ভাবী আমার পাশে বসা। হঠাৎ গোলাগুলি। ভাবী সাবতো দৌড় দিলেন ঘরে। রান্না তখন মোটামুটি শেষ। বাড়িতে একজন দেবর ছিলেন। তাকে বললেন, ভাতগুলো মাঠে পৌঁছে দিতে। কিন্তু তার শরীর ভাল ছিল না। তাই মাঠে ভাত আর পৌঁছে দেওয়া হলো না। গেলে হয়তো তিনিও মারা যেতেন।

ঘটনার আগের দিন রাতে তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমার যদি কিছু হয় তাহলে তুই তোর বাপের বাড়ি চিনে যেতে পারবি না? আমি

www.pathagar.com

অবাক হয়েছিলাম, আবার ভয়ও পেয়েছিলাম। বলেছিলাম, আপনি এসব কি বলেন, আর কেনই বা বললেন? তিনি আবারও বললেন যদি কিছু হয় চিনে যেতে পারবি কি না? আমি বলেছিলাম, আপনার কি হবে আর আপনাকে রেখেই বা আমি যাব কেন? তিনি তখনও বললেন গ্রামে মিলিটারিরা যেভাবে টহল দিচ্ছে তাতে গোলাগুলি হতেই পারে। তার উপর মুক্তিবাহিনীরা যে এ গ্রামে আসে ওদের কাছে সে খবর পৌঁছে গেছে। তাই গোলাগুলি শুরু হলে কে কিভাবে দৌড় দেয় কার গায়ে গুলি লাগে না লাগে ঠিক নাই।

রাতের এই কথাগুলো বার বার মনে হতে লাগল। স্বামীর কথাই কি ঠিক হতে চলেছে? আমি ভাবতে পারলাম না। বাড়ির অন্যান্যদের সাথে কান্নাকাটি করছি। তারপর হঠাৎ খবর পেলাম—মাঠের মানুষগুলো মারা গেছে। মিলিটারিরা আমাদের স্বামীদের মেরে ফেলেছে। সাতজন লোককে লাইন করিয়ে দাঁড় করায় মুক্তির কথা জানতে চেয়েছিল। তারা বলতে পারেনি। তারপর গুলি করে। আমি ঐ শব্দে পশ্চিমে চলে যাই। পশ্চিমটা তখন নিরাপদ মনে হচ্ছিল। অনেক মহিলারা সেদিন গিয়ে আশ্রয় নেয়। বেলা ১২টার দিকে অবস্থা একটু শান্ত হলে আমরা আবার যে যার বাড়িতে চলে যাই। বাড়িতে এসে অনেক কষ্টে স্বামীর লাশ বাড়িতে আনার ব্যবস্থা করি। ঐ সময় মিলিটারি দক্ষিণ সোহাগপুর গ্রামে ঢুকেছে। সেখান থেকে মিলিটারিরা কাকরকান্দি যায়। সেখান থেকে আবার ওরা এগ্রামে প্রবেশ করে। ওরা এসেই দেখে এই লাশগুলো আমাদের বাড়িতে আনা হয়েছে। এটা দেখে ওরা খুব রাগ করে। অনেক আজেবাজে গালাগালি দেয়। যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ওরা লাশগুলো বুট দিয়ে লাথি মারে, বিভিন্নভাবে লাশগুলো উল্টায় পাল্টায়। টেনে টেনে নেয়, বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করে তারপর আবার চলে যায়।

জোহরের নামাজের পর আমরা বাড়িতে আসি। পুরুষ মানুষ নাই। কে মাটি দেবে, কাকে ডাকি? দেখলাম এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিহারীরা। এরা কোথা থেকে গ্রামে এলো তাও বুঝলাম না। গ্রামে এর আগে বিহারীদের আনাগোনা ছিল না। ওদের কোনো দোকান পাটও ছিল না। শহরের দিকে ২/১টা থাকলেও থাকতে পারে

www.pathagar.com

কিন্তু সোহাগপুরে তাদের কোনো দোকান ছিল না বা বাসা-বাড়িরও ছিল না। মাগরিবের আগ দিয়ে কোনোরকম একটা কবর খুঁড়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ঐ সাতজন প্রিয় মানুষকে আমরা কবর দেই। কোনো গোছল, কোনো কাফনের কাপড় বা কোনো জানাজা তাঁরা পায়নি। আমরা আমাদের প্রিয়জনের লাশ মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওভাবেই দাফন করি।

আমার সন্তানরা বাপের আদর তেমন পায়নি। আমার সন্তান তার বাবাকে বাবাও ঠিকমতো ডাকতে পারেনি। অন্যদের দেখে তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, মা আমাদের বাবা নেই? আমি কি জবাব দেব ওদের তখন? বলেছি বাবারা তোমাদের বাবা ছিলেন। তোমরা ডাকলে তিনি আসবেন না। তবে বাবার কবর রয়েছে। তিনি শহীদ হয়েছেন। দেশের জন্য রক্ত দিয়েছেন। তারা বলে, কারা বাবাকে মেরেছে মা? আমি বলি, হায়নারা। মিলিটারি এসেছিল গ্রামে। তারা মেরেছে। আমার একটাই চাওয়া এইসব ঘাতক, আলবদর আর রাজাকারদের বিচার হোক।

www.pathagar.com

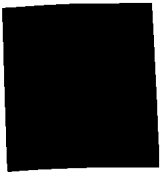

হাসনা আরা বেগম
বয়স : ৭০
স্বামী : শহীদ মেহের আলী

গ্রামের সাধারণ ঘরের মেয়ে ছিলেন হাসনা আরা বেগম। লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকেছেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে তাঁকে পথেই বের হতে হয়েছে। কান্নাকাটি করতে হয়েছে অচেনা ভিন্নদেশী হায়েনাদের কাছে আর তার সকল স্বপ্ন চুরমার করে দিয়েছে। সুন্দর স্বপ্নকে কবর দিয়েছে পায়ে দলে। তিনি তাঁর জীবনের স্মৃতিকথা তুলে ধরলেন এভাবে—

২৫ জুলাই ১৯৭১। সকাল বেলায় স্বামী ছেলেকে কোলে করে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিল। আমি রান্নাঘরে কাজ করছিলাম। সেদিনের সকালটা ছিল কেমন যেন। সারা আকাশ মেঘে ঢেকে ছিল। দমকা বাতাস ছিল। কালো মেঘ যেন গ্রাস করেছিল। মনে হচ্ছিল প্রচণ্ড বৃষ্টি হবে। অনেকেই সেদিন মাঠে গিয়েছিল। কেউ জ্বালা ভেঙেছে, কেউ লাঙল দিয়েছে, কেউ আগাছা পরিষ্কার করেছে। আমার স্বামী সেদিন কাজে যাননি। আকাশের অবস্থা ভাল ছিল না। তাই হয়তো কাজে যাননি তিনি।

তখন সকাল ৮টার মতো বাজে। হঠাৎ কানে গুলির শব্দ শুনলাম। এমনিতেই মানুষজন অল্প। বাড়িঘর অল্প। সোহাগপুর গ্রামের বাড়িঘরগুলো এখনও যেমন দেখা যায় ১৯৭১ সালেও তেমনি ছিল। এক একটি পরিবার মিলেই এক একটি বসত ভিটা। মাঝে বিশাল ব্যবধান। একটি পরিবারের বাসা বাড়ির মাঝে ব্যবধান বলতে গেলে একটি মাঠ মাঠ পেরুলেই আর একটি বাড়ি। সবই পায়ে হাঁটা। আগে ক্ষেতের আইলের উপর দিয়ে যাতায়াত করতে হতো। আজও অনেকের বাসাবাড়িতে যেতে হলে ঐ আইল ব্যবহার করতে হয়।

www.pathagar.com

পাশের বাড়ির ঐ ভদ্রলোক থেকে বিরক্ত হয়ে পড়েন। তিনি বাড়ির বউ, যে মিলিটারিদের আসার কথা ছিল তার হয়তো এসে পড়ে। আমি কালাম ওরা না আসেও এসেছিল, তখন যে কোনো ভয়ের কারণ ছিল না। তবু আপনি এমনভাবে কালেন! যেন ভয়ের কিছু হয়েছে। তিনি কালেন, হ্যাঁ, সেবার ওরা এসে বিভিন্ন স্থানে গর্ত করে দিয়েছে। দেখে শুনে কোথায় কে কিভাবে কাজ করে। ওরা এও বলেছিল, আগামীতে ওরা যখন আসবে তখন বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে। বউ তুমি ঘরে থাক। আমি একটু দেখে আসি। এই কথা বলে তিনি যখন গামছা (শিশু সন্তান) কে আবার কোলে দিতে যাবেন ঐ সময় বাড়িতে পাকিস্তানি মিলিটারির এলো। তারা উঠান জুড়ে দাঁড়ায়। হুকার দিয়ে কাল, বাড়িতে মুক্তি হ্যায়? মুক্তিকো নিকালো। স্বামী কালেন, মুক্তি নাই। ওরা কাল কিধার দিয়া, কবে দিয়া? স্বামী কালেন, মুক্তি আমার বাড়িতে থাকবে কেন! এটা আমার বাড়ি। আমার বাড়িতে আমি আমার পরিবার নিয়ে বাস করি। ওরা একথা শুনে স্বামীকে কালেন আমাদের সাথে যেতে। তিনি একথা শুনে কালেন, চলেন। সবাই যাব। তারা কালে বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে নয়। তোমাকে একা আমাদের সাথে যেতে হবে। তিনি কালেন, জানি তোমরা আমাকে নিয়ে হত্যা করবে। হত্যা যখন করবে তখন দু'জনকেই মারো। ওরা কাল, না তোমাকে একাই যেতে হবে। স্বামীকে নিয়ে ওরা টানা-হেঁচড়া শুরু করল। আমিতো কান্নাকাটি করছি। আল্লাহকে ডাকছি। মিলিটারির একজন হঠাৎ আমার ছেলেকে টান মেরে স্বামীর কাছ থেকে ছিনিয়ে মাটিতে ছুড়ে ফেলে। বাচ্চাটা এমনিতেই ভয়ে কান্না করছিল। ওভাবে তাকে ছুড়ে ফেলার পর তার সে কান্নাই থেমে গেল। মনে হলো তার দমটা আটকে গেছে। আমি দৌড়ে ছেলেকে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। ওকে আদর করলাম। ছেলে কতক্ষণ পর দম নিয়েছে তা মনে নেই। কারণ তখন আমার খেয়াল স্বামীর দিকে।

ওরা আমার স্বামীকে চোখের সামনে নিয়ে নিয়ে গেল। আমাকে বলে গেল এখান থেকে নড়বে না। আমি মাটিতে বসে কান্নাকাটি করছি। মাটি চাপড়াচ্ছি। আল্লাহকে ডাকছি। ওরা স্বামীকে ক্ষেতের পাশ দিয়ে নিয়ে গেল। আর তখুনি কানে পর্দা ফাটানো গুলির শব্দ আসলো। আমার স্বামীর চিৎকার কানে এলো। বুঝতে বাকী রইল না

www.pathagar.com

ওর স্বামীকে খুন করেছে। আমি আল্লার কাছে শিরোধার্য করে করিয়াদ জানালাম, হে আল্লাহ, ওর সকল গুনাহ আমাকে দিয়ে দাও, ওর সকল গুনাহ মাফ করে দাও, ওর আত্মা শান্তিতে থাকুক—তা পবিত্র রক্তের আমাদের মাটি আরও পবিত্র হোক। এভাবে কান্নাকাটি করতে করতে আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।

জ্ঞান ফিরে দেখি আমার পাশে আমার বড় ছেলে বসে। ও আমাকে বলে মা বাজানরে ওরা মেরে ফেলেছে। বাজানের লাশটা বাইরে পড়ে রয়েছে। আমি বলি, নারে বাপ, তোর বাজান হয়তো মরে নাই। চল দেখি। আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখি তার লাশটা পড়া পুরো জায়গা জুড়ে তার রক্ত। মাটি ভিজে গেছে। আমি এ দৃশ্য দেখতে পারছিলাম না। মাথাটা ঘুরে উঠে। আমি বসে পড়ি। এমন অন্যান্য বাসাবাড়ির দিক থেকেও মেয়েছেলেদের কান্নার রোল শোনা যাচ্ছিল। বুঝলাম, সেখানেও কাটকে না কাটকে হত্যা করা হয়েছে। এদিকে বড় ছেলেটি দেখি সে আমার পাশে পড়ে রয়েছে। তাকে ডাকি, সে উত্তর দেয় না। আদর দিলাম, দেখি সে নড়ে না। একটু কাছে গিয়ে বুঝি, ছোট বয়সে বাবার এরকম মৃত্যু সে সহ্য করতে পারেনি। জ্ঞান হারিয়েছে ছেলেটি। বাবার ভীষণ আদরের এই ছেলেটি। আমি ওকে কোনোরকম বাড়ির ভেতর এনে মাথায়, চোখেমুখে পানির ঝাপটা দিয়ে জ্ঞান ফেরাই। ওর জ্ঞান ফিরলে অনেক কাঁদে। ওর একটা প্রশ্ন আমার বাবার কী দোষ ছিল মা? ওরা আমার বাজানরে কেন মারল? তারপর বলে, মা আমার বাজানরে এনে দাও। বাজানরে বাড়ির ভেতর নিয়ে আসো। আমি বললাম, কিভাবে আনবো। আমার কোলে প্যাদা (শিশু) ছেলেকে নিয়ে কিভাবে তোমার বাজানরে আনবো? ও কিছুতেই মানতে চায় না। ছেলে বলে, বাইরে থাকলে যদি কুকুর শিয়াল এসে বাজানরে খেয়ে ফেলে? ও হঠাৎ বলে, মা বাজানরে ভাত দাও, পানি দাও, পান দাও। আমি ওকে অনেক চেষ্টা করেছি স্বাভাবিক করার জন্য। কিন্তু ওর এক কথাই বাজানের এনে দাও।

আসরের পর অনেক চেষ্টা করে অন্যান্যদের সহযোগিতায় স্বামীর লাশটা টেনে কোনোরকমে কবর দেই। না গোছল, না দাফন, না জানাযা। কিন্তু আমার প্রশ্ন, মুসলমানদের কাছ থেকে এমন প্রত্যাশা

www.pathagar.com

কি ছিল? ওরাতো মুসলমান ছিল। ওরা জানত আমরাও মুসলমান ছিলাম। আমরা ওদেরকে গুলি করিনি, বোমা মারিনি। এগুলো দেখতে কেমন এটাও জানি না। তবু ওরা চোখের সামনে স্বামীদের ডেকে ডেকে হত্যা করে। আল্লাহ সব দেখেছেন—দুনিয়ায় বিচার দেখে যেতে পারলে আমি মরেও শান্তি পাব। আমরা গরিব মানুষ। কোন থানায় যাব, বিচার চাইব জানি না। আপনারা এ কথাগুলো শুনতে চেয়েছিলেন, আমি মূর্খ মানুষ আমার মতই বলেছি। বিচারটা আপনারাই ব্যবস্থা করবেন।

www.pathagar.com

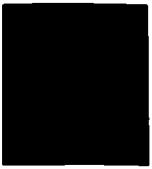

জোবেদা খাতুন
বয়স : ৬৫
স্বামী : শহীদ বাবর আলী

জোবেদা খাতুনের বাড়িতে যেদিন হাজির হই সেদিন আকাশটা ছিল সুন্দর। বিকেল হতে তখনও অনেকক্ষণ বাকি। আমরা চেষ্টা করেছিলাম যাতে কাজটা সমাপ্তি করতে পারি। তিনি আমাদের বসতে দিলেন। বললেন, শুধু শুধু শুনবেন নাকি কোনো কাজে লাগবে? আমি বললাম, খালা আপনি বলেন, আমি চেষ্টা করব, এসব কোথাও লেখা থাকুক। অনেক কঠিন কাজ—ইতিহাস সংরক্ষণ করতেই হবে। তিনি বললেন, লেখা ছাপলে দেবেন কিন্তু। আমি মাইক্রোফোন অন করলাম। তিনি বললেন—

মঙ্গলবার ছিল সেদিন। স্বামী নালিতাবাড়ি যেতে চেয়েছিলেন। কামলা নেয়া হয়েছিল মাঠের কাজের জন্য। তিনি বললেন নাস্তা তৈরি করো। এই বলে তিনি পাশেই ছিল ভাসুরের বাড়ি, সেখানে গেলেন। তখন গোলাগুলি হচ্ছিল। তিনি ভাসুরকে বললেন, এতো গোলাগুলি হচ্ছে। তোমরা ঘরে কেন? ঘর থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাও। আমরাও চলে যাচ্ছি। এই বলে তিনি বাড়িতে চলে গেলেন। তখন আমার এক ছেলে (ছোট) অন্যটি পেটে। তিনি আমাদেরকে নিয়ে কবির উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত এলেন। ঐ সময় পাকিস্তানি মিলিটারিরা ঐ পথে এগিয়ে এসে আমাদের থামতে বলে। ওরা দুজনকে দূরে নিয়ে কি সব জিজ্ঞাসা করল আমি কিছুই বুঝি নাই। ঐ পথে আরো দুজন লোক যাচ্ছিলেন, তাদেরও থামতে বলে। কিছু জানতে চায়। তারপর আমার স্বামীসহ পাঁচজনকে একত্রে লাইনে দাঁড় করায়। পলকে গুলি করে। আমার

www.pathagar.com

স্বামী ছিটকে পড়ে লাফাতে থাকেন। পাঁচজন লোক মারা যান। আমিতো বেহুশ হয়ে গেলাম। পড়ে গেছি। ঐ সময় মাটিতে পড়ে যাওয়া কি যে কষ্টের তা কেবল মায়েরাই বুঝতে পারেন। দশদিন পর আমার একটি মৃত সন্তান হয়।

কোলের সন্তানকে নিয়ে কোনো রকম উঠে হাঁটতে থাকি। কোথায় যাব জানি না। মেঘ-বৃষ্টি-ঝড় মাথায় নিয়ে হাঁটতে থাকি। এক কাপড়ে পথ চলা। বৃষ্টিতে ভিজেছি ঐ কাপড় শরীরে শুকিয়ে গেছে। এমনভাবে বিকাল হয়ে গেল। এক বাড়িতে আমার ভাসুরের ছেলে আমাকে দেখে দৌড়ে আসে। বলে, চাচী, চাচী, তোমরা! চাচা কোই? আমি তখন অশ্রু ধরে রাখতে পারিনি। হু হু করে কেঁদে দিয়েছি। বলেছি, তারে তো মেরে ফেলে রেখেছে ঐ রাস্তায়। ছেলেটি গ্রামের কিছু লোককে দিয়ে খুব সাবধানে তারপর রাস্তায় যায় এবং লাশ এ বাড়িতে নিয়ে আসে। একজন ভাগ্নে ছিল। তারও নয় মাসের ছেলে ছিল। তাকেও ঐ একই জায়গায় মিলিটারিরা গুলি করে হত্যা করে। তাকে ধরাধরি করে উঠানে নিয়া আসা হয়। আমার বাসায় ওর কবর দেওয়া ঝুঁকি হবে বলে এই বাড়ির উঠানেই একটা গর্ত করে কোনোরকম মাটি চাপা দেওয়া হয় লাশ। আমরা কোনো কাফন জানাযা করতে পারিনি। যে কোনো সময় মিলিটারি চলে আসতে পারে সেই ভয়ে।

স্বামীর লাশ দাফন করে এখানেই বাস করতে থাকি কোনো রকম। বারান্দায় কোণে এ বাড়িতে তখন অনেক লোকজন। এতো মানুষের খাবার জোগাড় করা কঠিন হয়ে পড়ে। আমরা মেয়েরা তারপর বিভিন্ন বাসাবাড়ির কাজ খুঁজতে নাকি। সামান্য যাই পাই তাই নিয়ে বাড়ি ফিরে আসি। বাচ্চাকে দেই কিন্তু খুবই অল্প। হয়তো এক মুঠ দুই মুঠ খাবার। দিনে একবার ঐ অল্প খাবারে ঐ বাচ্চা অসুস্থ হয়ে পড়ে। এক সময় দেখি নড়াচড়া করতে পারছে না। শরীরে একটুও বল নেই। চোখের পাতাও ধীরে পড়ছে। ঐ অবস্থায় কাজে যেতে পারিনি। স্বামী মাটির নিচে শুয়ে উপরে এক শিশু মৃতপ্রায়। আল্লাহ কিসে এক কঠিন পরীক্ষায় ফেললেন। একদিন সকালে উঠে দেখি আমার সন্তান নড়ছে না। স্থির তাকিয়ে রয়েছে। মুখটা সামান্য খোলা। ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরে অনেক কেঁদেছি। বলেছি, বাপ, আমারে মাফ করিস বাপ। তোর মুখে খাবার তুলে দিতে পারিনি। তুই অপেক্ষা কর বাপ। আমিও

www.pathagar.com

হয়তো কিছুদিন বাঁচব। আমি এসে আবার আমরা একসাথে থাকব, তোদেরকে পেট পুরে তখন রান্না করে খাওয়াব। তোর বাজানরে নিয়ে আমরা সবাই একত্রে থাকব।

আমিও আজও আমার শিশু সন্তানকে অনেকের মাঝে পাই। তাদেরকে আদর করি। আমার শাড়ির আঁচলে যাই থাকুক ওদের দেই। গ্রামের সবাই আমাকে চেনে ওরা কিছু বলে না। আমি মনে করি হয়তো ছেলেটি ফিরে এসেছে।

তবে আমার কষ্টটা আজও যায়নি। আমি কোনো বিচার পেলাম না। বিচার চেয়েছি পথে পথে। পথের মানুষের কাছে, গাছপালা সবুজ বনের কাছে, এই আকাশটা, ঐ মেঘ কিংবা রোদ—সবার কাছে আমি বিচার চেয়ে গেলাম। আমার স্বামী হত্যার বিচার চাই, আমার পেটের সন্তান হত্যার বিচার চাই, আমার অনাহারি শিশুর হত্যার বিচার চাই। বিচার করতেই হবে।

www.pathagar.com

[redacted]

শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ি থানার রাজাকারদের তালিকা :

১. রাজাকার-মোঃ আঃ রহমান হাজী, পিতা-হাছেন আলী, গ্রাম-গোবিন্দনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

২. রাজাকার-আকরামুজ্জামান, পিতা-হাছেন আলী, গ্রাম-গোবিন্দপনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৩. রাজাকার-আঃ মালেক, পিতা-কাশেম আলী, গ্রাম-গোবিন্দনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৪. রাজাকার-আঃ হান্নান, পিতা-কাশেস আলী, গ্রাম-গোবিন্দনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৫. রাজাকার-আঃ হাই, পিতা-কাসেম আলী, গ্রাম-গোবিন্দনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৬. রাজাকার-আঃ বাহিক, পিতা-কাসেম আলী, গ্রাম-গোবিন্দনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৭. রাজাকার-আওয়াল, পিতা-কাসেম আলী, গ্রাম-গোবিন্দনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৮. রাজাকার-হাবিবউল্লাহ, পিতা-হাজী শামসুদ্দিন (সূফী), গ্রাম-গোবিন্দনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৯. রাজাকার-মোতালেব, পিতা-হাজী শামসুদ্দিন (সূফী), গ্রাম-গোবিন্দনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১০. রাজাকার–আবদুল্লাহ পিতা-হাজী শাসুদ্দিন (সূফী), গ্রাম-গোবিন্দনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১১. রাজাকার-আসাদুল্লাহ, পিতা কাসেম আলী, গ্রাম-গোবিন্দনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

www.pathagar.com

১২. রাজাকার-আঃ রাজ্জাক পিতা মেহের আলী গ্রাম-গোবিন্দনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১৩. রাজাকার-আঃ রেজ্জাক, গ্রাম-গোবিন্দনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১৪. রাজাকার-সিরাজ, পিতা-খলিলুর রহমান, গ্রাম-গোবিন্দনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১৫. রাজাকার ইদ্রিস আলী, পিতা-সৈয়দ আলী গ্রাম, গ্রাম-গোবিন্দনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১৬. রাজাকার-রিয়াজ উদ্দিন, পিতা-খলিলুর রহমান, গ্রাম-গোবিন্দনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১৭. রাজাকার-মান্নান, পিতা-নজর আলী, গ্রাম-গোবিন্দনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১৮. রাজাকার-আফছার, পিতা-আতাবদ্দিন, গ্রাম-গোবিন্দনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১৯. রাজাকার-রহিম, গ্রাম-গোবিন্দনগর, থানা-নালিতাবাড়ি,

২০. রাজাকার-রশিদ, গ্রাম-গোবিন্দনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

২১. রাজাকার-নুর মোহাম্মদ, পিতা-আঃ হাকিম ডাক্তার, গ্রাম-ছিটপাড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

২২. রাজাকার-জামানউদ্দিন, পিতা-আঃ হাকিম ডাক্তার, গ্রাম-ছিটপাড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

২৩. রাজাকার-হছেন আলী, পিতা-আইনুদ্দিন মুন্সী, গ্রাম-ছিটপাড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

২৪. রাজাকার-জৈনদ্দিন (জনু), পিতা-তরু ফকির, গ্রাম-ছিটপাড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

২৫. রাজাকার-রহিম, পিতা-হামির উদ্দিন, গ্রাম-ছিটপাড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

২৬. রাজাকার-জমির উদ্দিন, পিতা-আবুল হুসেন, গ্রাম-ছিটপাড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

২৭. রাজাকার-ছাত্তার, গ্রাম-গোবিন্দনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

www.pathagar.com

২৮. রাজাকার-রজব আলী, গ্রাম-গোবিন্দনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

২৯. রাজাকার-ফজু, গ্রাম-গোবিন্দনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৩০. রাজাকার-চাঁন মিয়া, গ্রাম-গোবিন্দনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৩১. রাজাকার-মান্নান, পিতা-আবেদ আলী, গ্রাম-নামাছিটপাড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৩২. রাজাকার-ছালাম, পিতা-শরাফত, গ্রাম-গোবিন্দনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৩৩. রাজাকার কাদির, পিতা-ছৈয়দ আলী, গ্রাম-গোবিন্দনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৩৪. রাজাকার-দুদু, পিতা-শামছুদ্দিন ডাক্তার, গ্রাম-মোগালিয়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৩৫. রাজাকার-আজাদ, পিতা-ছাবেদ আলী, গ্রাম-মোগালিয়া, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৩৬. রাজাকার-রশিদ, গ্রাম-মোগালিয়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৩৭. রাজাকার-আক্কাছ আলী চেয়ারম্যান, পিতা-ছাবেদ আলী, গ্রাম-মোগালিয়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৩৮. রাজাকার-ইছব আলী মুন্সী, পিতা-জৈধর আলী, গ্রাম-মোগানিয়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৩৯. রাজাকার-আঃ আজিজ, পিতা-মহর, গ্রাম-কপাশিয়া থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৪০. রাজাকার-আকবর আলী, পিতা-আর মামুদ, গ্রাম-বনপাড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৪১. রাজাকার-খায়রুল (খলিলুর), পিতা-মহর আলী, গ্রাম-কাপাসিয়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৪২. রাজাকার-আব্দুল গফুর, পিতা-রহমত উল্লা, গ্রাম-কাপাসিয়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

www.pathagar.com

৪৩. রাজাকার-শামছুদ্দিন, পিতা-ওছিমুদ্দিন, গ্রাম-কাপাসিয়া, থানা-নালিতাবাড়ি,

৪৪. রাজাকার-আব্দুল বাশার, পিতা-আঃ আজিজ, গ্রাম-কাপাসিয়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৪৫. রাজাকার-শামছুদ্দিন, পিতা নছিমুদ্দিন, গ্রাম-কাপাসিয়া, থানা-নালিতাবাড়ি,

৪৬. রাজাকার-পাঞ্জাব আলী, পিতা-কাশেম আলী, গ্রাম-বাথুরাকান্দা, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৪৭. রাজাকার-মালেক, পিতা-ডিবু শেখ, গ্রাম-বাথুরারকান্দা, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৪৮. রাজাকার-মোফাজ্জল ভেন্ডার, পিতা-সিরাজুল হক, গ্রাম বাইটকামারী, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৪৯. রাজাকার-জুলহাস উদ্দিন, পিতা-মোহাম্মদ আলী, গ্রাম-বাইটকামারী, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৫০. রাজাকার-লতিফ, পিতা-বছির উদ্দিন, গ্রাম-বাইটকামারী, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৫১. রাজাকার আঃ রহমান, গ্রাম–কোন্নগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৫২. রাজাকার-হাশমত আলী, গ্রাম–কোন্নগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৫৩. রাজাকার-আনছারুল হক, পিতা-মুনছুর আলী, গ্রাম-কোন্নগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৫৪. রাজাকার-আমীর আলী, পিতা-আহম্মদ আলী, গ্রাম-রানীগাঁও, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৫৫. রাজাকার-মনির, পিতা-জিন্নত আলী, গ্রাম-রানীগাঁও, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৫৬. রাজাকার-বাতেন, পিতা-জিন্নত আলী, গ্রাম-রানীগাঁও, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৫৭. রাজাকার-আঃ রহিম, পিতা-আহম্মদ, গ্রাম-রানীগাঁও, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

www.pathagar.com

৫৮. রাজাকার-আবু বকর, পিতা-আহম্মদ আলী, গ্রাম-রানীগাঁও, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৫৯. রাজাকার-আবু সাইদ, পিতা-আইনুদ্দিন, গ্রাম-রানীগাঁও, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৬০. রাজাকার-রইছুদ্দিন বাইন্না, পিতা-আউনুদ্দিন, গ্রাম-কালিনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৬১. রাজাকার-আঃ লতিফ, পিতা-আউনুদ্দিন, গ্রাম-কালিনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৬২. রাজাকার-জামাল উদ্দিন, গ্রাব–কালিনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৬৩. রাজাকার-মোফাজ্জেল হোসেন, গ্রাম-কালিনগর, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৬৪. রাজাকার-ছোবনি (দুদু), পিতা-মহর হাজী, গ্রাম-কালিনগর, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৬৫. রাজাকার-হুসেন আলী, পিতা-ছফুর উদ্দিন, গ্রাম-কালিনগর, থানা নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৬৬. রাজাকার আকিতুল্লা, পিতা- হাছেন আলী, গ্রাম-কালিনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৬৭. রাজাকার-হাছেন আলী (কোচা), পিতা-সাহেব আলী, গ্রাম-কালিনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৬৮. রাজাকার হরমুজ আলী, পিতা-নছর দেওয়ানী, গ্রাম বাঘরেড় আখড়াপাড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৬৯. রাজাকার-অহেদ আলী, পিতা-রহমত আলী, গ্রাম-শিমুলতলা, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৭০. রাজাকার-মোহাম্মদ উল্লা, পিতা-আতর আলী মুন্সী, গ্রাম-শিমুলতলা, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৭১. রাজাকার-নবী হুসেন, পিতা-জামাল উদ্দিন, গ্রাম-শিমুলতলা, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৭২. রাজাকার-কালু, পিতা-মকবুল মেম্বার, গ্রাম-খালডাঙা, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

www.pathagar.com

৭৩. রাজাকার-কাজিমউদ্দিন, গ্রাম-খালডাঙা, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৭৪. রাজাকার-আমজাত, পিতা-কফিল উদ্দিন, গ্রাম-চকপাড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৭৫. রাজাকার-নুরা, গ্রাম-চকপাড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৭৬. রাজাকার-রফিজউদ্দিন দেওয়ান, পিতা-লালু মৃধা, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৭৭. রাজাকার-আজগর আলী খান, পিতা-জোনাব আলী খান, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৭৮. রাজাকার-লিয়াকত, পিতা-ছয়ফল, গ্রাম-নালিতাবাড়ি বাজার, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৭৯. রাজাকার-শামছুল হক, গ্রাম-গেরাপচা, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৮০. রাজাকার-আব্দুল করিম, পিতা-আশ্রাফ হাজী, গ্রাম-গেরাপচা, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৮১. রাজাকার-দিল মামুদ, পিতা-উমেদ আলী, গ্রাম- ছালুয়াতলা, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৮২. রাজাকার-হাছেন আলী, পিতা-বদন শেখ, গ্রাম-সোহাগপুর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৮৩. রাজাকার-তোফাজ্জল, পিতা-কোরবান আলী, গ্রাম-চকপাড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৮৪. রাজাকার-আঃ কাদির, পিতা-শরাফাত আলী, গ্রাম-কেন্দুয়াপাড়া-থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৮৫. রাজাকার-গোলাম মোস্তফা, পিতা-রাইসউদ্দিন তালুকদার, গ্রাম-সোহাগপুর, থানা-নালিতাবাড়ি,

৮৬. রাজাকার-আঃ রহিম, পিতা-রিয়াজত আলী, গ্রাম-বারুয়াজানি, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৮৭. রাজাকার-আঃ খালেক মাস্টার, পিতা-আহমদ আলী, গ্রাম-ঘাতপাড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৮৮. রাজাকার-আমজাদ আলী, গ্রাম-খাইলারা, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

www.pathagar.com

৮৯. রাজাকার-মকবুল হোসেন, পিতা-ছামাদ আলী, গ্রাম বেনুপাড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৯০. রাজাকার-আঃ কুদ্দুছ, পিতা-কুদ্রত আলী, গ্রাম-বনুকড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৯১. রাজাকার-রকিব, গ্রাম-বনুকড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৯২. রাজাকার-কুদ্রত আলী, গ্রাম-বনুকড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৯৩. রাজাকার-ওসমান গণি, পিতা-তনিসেখ, গ্রাম-নন্নীউত্তর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৯৪. রাজাকার-ওলি মামুদ, পিতা-কমরউদ্দিন, গ্রাম-নিশ্চন্তপুর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৯৫. রাজাকার-বিশু মিয়া, গ্রাম-বারমারী, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৯৬. রাজাকার-সুরুজ চৌকিদার, গ্রাম-বারমারী, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৯৭. রাজাকার-আঃ কাদির, পিতা-আঃ গফুর, গ্রাম-রাজনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৯৮. রাজাকার-হায়দার আলী, পিতা-নূর আলী, গ্রাম-চাঁদগাঁও, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

৯৯. রাজাকার-আলেপ উদ্দিন, পিতা-রইছ উদ্দিন, গ্রাম-রাজনগর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১০০. রাজাকার-মকবুল হুসেন, পিতা-কাশেম আলী, গ্রাম-হাতীপাগার, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১০১. রাজাকার-কালু, পিতা-ছফুর সরকার, গ্রাম-বইগাইচাপুর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১০২. রাজাকার-ইলাম, পিতা-ছফুর সরকার, গ্রাম-বইগাইচাপুর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১০৩. রাজাকার-ছফর উদ্দিন, পিতা-ওষন শেখ, গ্রাম-কেন্দুয়াপাড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১০৪. রাজাকার-তোফাজ্জাল, পিতা-শরাফত আলী, গ্রাম-নয়ারিল, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

www.pathagar.com

১০৫. রাজাকার-কাইয়ুম, পিতা-মোতালেব মেম্বার, গ্রাম-চাঁদগাঁও, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১০৬. রাজাকার-নজরুল ইসলাম, পিতা-রুস্তম আলী, গ্রাম-চাঁদগাঁও, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১০৭. রাজাকার-মহির উদ্দিন, পিতা-কাছুম শেখ, গ্রাম-কেন্দুয়াপাড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১০৮. রাজাকার-নারা, পিতা-ইব্রাহিম, গ্রাম-গুজাবুড়াম, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১০৯. রাজাকার-নূর মোহাম্মদ, গ্রাম-কিল্লাপাড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১১০. রাজাকার-আলী, পিতা-লিলু, গ্রাম-বইগাইচাপুর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১১১. রাজাকার-হাশেম, পিতা-ইমাম, গ্রাম-বইগাইচাপুর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১১৩. রাজাকার-আবুল কালাম আজাদ, পিতা-শামছুদ্দিন গ্রাম-বইগাইচাপুর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১১৪. রাজাকার-আবুল ফজল (আংগুর), পিতা-মোবারক উল্লাহ, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১১৫. রাজাকার-মোহাম্মদ হুসেন, পিতা-আমানুল্লাহ হাজী, গ্রাম-তারাগঞ্জ বাজার, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১১৬. রাজাকার-সিরাজ, পিতা-আমানুল্লাহ হাজী, গ্রাম-তারাগঞ্জ বাজার, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১১৭. রাজাকার-জোয়াদ আলী, গ্রাম-নন্নী নয়াপাড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১১৮. রাজাকার-মন্তাজ আলী, পিতা-জয়নুদ্দিন, গ্রাম-নন্নী নয়াপাড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১১৯. রাজাকার-সোহরাব, গ্রাম-বারমারী, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১২০. রাজাকার আঃ হক, গ্রাম-নন্নী উত্তর, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১২১. রাজাকার-জিয়ার উদ্দিন, গ্রাম-বন্দধারা, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

www.pathagar.com

১২২. রাজাকার-আহসান আলী, পিতা-সফর আলী, গ্রাম-ভজাকুড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১২৩. রাজাকার-জয়নাল আবেদীন, পিতা-আইনুদ্দিন, গ্রাম-কয়রাপাড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১২৪. রাজাকার-মাঃ খালেক, পিতা-নইমুদ্দিন, গ্রাম-কয়রাপাড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১২৫. রাজাকার-নয়রুদ্দিন, গ্রাম-কয়রাপাড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১২৬. রাজাকার-কুদ্দুস আলী, পিতা-হোসেন আলী, গ্রাম-ভজাকুড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১২৭. রাজাকার-হাবিবউদ্দিন, পিতা-নবাব আলী, গ্রাম বাশকান্দা, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১২৮. রাজাকার-জোহরার আলী, পিতা-আহমদ আলী, গ্রাম-বাশকান্দা, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১২৯. রাজাকার-পারো, পিতা-বসু, গ্রাম-বাশকান্দা, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১৩০. রাজাকার-মাজ উদ্দিন (৪ ভাই), পিতা-বিরাজ আলী, গ্রাম-মজিদপুরান, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১৩১. রাজাকার-মাঃ আজিজ, পিতা-আয়েন উদ্দিন, গ্রাম-জোনাইরপাড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১৩২. রাজাকার-হজরত আলী, পিতা-ছবি শেখ, গ্রাম-জোনাইরপাড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১৩৩. রাজাকার-বুরুজ আলী, পিতা-হজরত আলী, গ্রাম-জোনাইরপাড়া, থানা-নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১৩৪. রাজাকার-হাজী আব্দুল রহমান, সাং- নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১৩৫. রাজাকার-আজহার উদ্দিন খান, সাং- নালিতাবাড়ি, শেরপুর

১৩৬. রাজাকার-মহীন নাজমুল আহসান, পিতা-মৃত সেকান্দার আলী

১৩৭. রাজাকার-মৃত আহসান আলী, সাং-বরোয়াজানী

১৩৮. রাজাকার-আলী হোসেন, পিতা-আব্দুল মোতালেব।

* ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের যে সেক্টর-বীর থেকে তালিকাটি সংগৃহীত

www.pathagar.com

www.pathagar.com